অনুকূলচন্দ্র [illegible]পাধ্যায় প্রণীত।

হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য বার আনা।

উপহার।

লোকের দুঃখে যাঁহার
প্রাণ কাঁদে, প্রকৃতিরঞ্জনে যাঁহার
প্রাণপণ প্রয়াস, প্রজার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে
ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ টেলিফোঁ
স্থাপনে এবং খাত খননে যাঁহার পবিত্র নাম চিরস্মরণীয়
হইয়াছে, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদির অনুশীলনে যাঁহার প্রগাঢ়
অনুরাগ, উৎকলবাসী হইলেও যাঁহার নিকট বঙ্গভাষা বিশেষ
সমাদৃত, সেই অশেষ গুণালঙ্কৃত, বিদ্যোৎসাহী, প্রজাবৎসল
বামড়াধিপতি শ্রীমন্মহারাজ শ্রীল
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন
দেব মহোদয়ের করকমলে,
ঐকান্তিকী প্রীতি সহকারে,
"বঙ্গলক্ষ্মী"
সমর্পিত
হইল।

আমি হিন্দু। কাজেই হিন্দু সমাজের উন্নতিপ্রয়াসী। হিন্দু সমাজের অবনতি দেখিলে প্রাণে ব্যথা লাগে।

হিন্দু রমণী চিরকালই আদর্শ সতী। হিন্দু ললনার পাতিব্রত্য ভুবনবিদিত। কালের বশে, সমাজের অবনতিতে সেই হিন্দু মহিলাগণের চরিত্র অধুনা পাশ্চাত্য সমাজের নিকৃষ্ট অনুকরণে গঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেরই মর্ম্মপীড়াদায়ক।

"বঙ্গলক্ষ্মী"তে হেমলতার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে। হিন্দুর গৃহে এখনও ঐরূপ দেবী বিরাজ করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে বোধ হয় হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও এত দিনে বিলুপ্ত হইত।

যাহাতে হিন্দুর ঘরে ঘরে দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই—হিন্দুগৃহে সেই পবিত্র পুণ্যভাব পুনর্ব্বার সমুদিত হয়, তদুদ্দেশ্যে "বঙ্গলক্ষ্মী" প্রকাশিত হইল। নতুবা এই উপন্যাস-নাটক-আ[illegible] দেশে "বঙ্গলক্ষ্মী" প্রকাশের কোনই প্রয়োজন ছিল [illegible]

"বঙ্গলক্ষ্মী" পাঠে যদি একটী মহিলার [illegible] হয়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইল, ভা[illegible]

কলিকাতা,
[illegible]শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

[illegible] প্রকাশক।
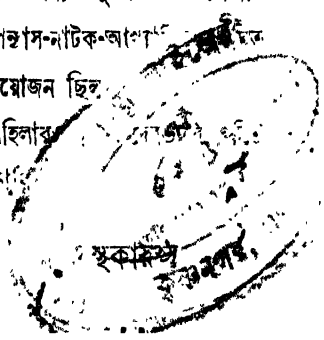
বঙ্গলক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সকলই ফুরাইল।

টিপ্, টিপ্, টিপ্। প্রাবৃটের বর্ষণের আর বিরাম নাই, দিবানিশি জল পড়িতেছে। পর্জ্জন্যদেব স্বকীয় প্রকোপ প্রদর্শনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আকাশ ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন। দিবা দ্বিপ্রহরেও সূর্য্যের মুখ দেখা যাইতেছে না। সেই দুর্যোগে মুষলধারায় বৃষ্টি-পতন ও ভীষণ অশনি-সম্পাতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একাকী এক ব্রাহ্মণ-যুবক এক বিস্তৃত প্রান্তর পদব্রজে অতিক্রম করিতেছিলেন।

চতুর্দ্দিক জলে জলময়—যেন সৃষ্টিলোপের জন্য প্রলয়োৎপত্তি হইয়াছে। প্রান্তরস্থ বৃক্ষাবলী পবনতাড়নে বিষম আলোড়িত হইতেছিল। প্রকৃতিসতীর এই বিকট রূপ দেখিয়া সকলেই সশঙ্ক। কিন্তু সেই দীর্ঘ-প্রান্তর-অতিক্রমকারী যুবক নির্ভীকচিত্তে গন্তব্য পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

যুবকের বয়স ১৮।১৯ বৎসর হইবে। দেহ বলিষ্ঠ ও সুঠাম। যুবক দ্রুতপদে প্রান্তর পার হইলেন। প্রান্তরের শেষভাগে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম—নাম হরিহরপুর। গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। গ্রামখানি দেখিলেই শ্রীসম্পন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। পথিক কিন্তু কোন সুরম্য হর্ম্মে প্রবেশ করিলেন না—গ্রামের প্রান্তভাগস্থ এক পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই যুবক কম্পিতস্বরে বলিলেন "মা! কেমন আছেন?" তাঁহার কণ্ঠ তখন শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। যুবকের নাম হেমচন্দ্র। যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে "মাগো, মাগো" বলিয়া সত্বর কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। শয্যার আস্তরণ মলিন ও ছিন্ন। যুবক একবার জননীর মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, বদনমণ্ডলে মৃত্যু-ছায়া প্রকটিত হইয়াছে। একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভাবিলেন, ভগবান কি সত্য সত্যই তাঁহাকে বিস্তৃত সংসার-মরুতে মাতৃহীন করিবেন। যুবকের যে আর কেহ নাই—সংসারে জননীই একমাত্র অবলম্বন। মীন কি কখন বারিহীন হইয়া বাঁচিতে পারে? এ সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে আর কে আছে? সংসারাকাশে মাতাই তাঁহার একমাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপিনী। যুবক শোকমগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। যাহার জন্য ভীষণ ঝটিকাতেও দৃক্‌পাত না করিয়া কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনয়ন করিয়াছেন, সেই গর্ভধারিণী স্নেহময়ী জননী বিনা ঔষধে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, ইহা যুবকের সহ্য হইল না। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে জননীকে ঔষধ সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবন করিয়া রোগিণী যেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। তিনি

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। রোগিণী অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"বাবা! আমি চলিলাম। ভগবৎ চরণে একমাত্র প্রার্থনা, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। আজ হইতে এই সুবিশাল সংসারে ভগবান তোমার অবলম্বন হইলেন। বড় সাধ ছিল, তোমার বিবাহ দেখিব—বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিলেন। তাঁহার মঙ্গলেচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

যুবক কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মা—অমন কথা মুখে আনিও না—এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইবে। আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে মা?—আমি যে তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না। তুমি না থাকিলে আমারও প্রাণ যাইবে—আমিও তোমার সঙ্গে যাইয়া চরণ সেবা করিব। মাতৃহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা মৃত্যু অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।"

হেমের কথায় রোগিণীর নেত্রনীর প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। রোগিণী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাছা! অধীর হইও না। মানুষ চিরকাল বাঁচে না। আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে—আমি যাইতেছি। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, এ সংসারে ধর্ম্মই জীবনের প্রধান অবলম্বন। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার অবিচলিত মতি থাকুক—তুমি সংসারে দশজনের একজন হইয়া বংশের তিলক হও।" কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগিণীর কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল—মৃত্যু আসন্ন হইল। তখন হেমচন্দ্র শশব্যস্তে রোগিণীর মুখে গঙ্গোদক প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন জননীর আর গঙ্গোদক গলাধঃকরণের শক্তিও নাই। হেমচন্দ্র কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে রোগিণীর প্রাণবায়ু বহির্গত

হইল। যে ক্ষীণ দীপশিখা-সদৃশ জীবনীশক্তি রোগিণীর দেহ আলোকিত করিয়াছিল, কালের প্রবল তাড়নে—নিয়তির নিষ্পেষণে তাহা নির্ব্বাপিত হইল। এমনই জগতের গতি—প্রকৃতির নিয়ম। যিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পুত্রের চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন, তিনি মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া সকল সংজ্ঞাই হারাইলেন। মানুষ ইহা বুঝিয়া বুঝে না, জানিয়াও জানে না। যে মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া জীব "আমার আমার" করিয়া থাকে, তাহা যে অনিত্য, অসার, তাহা প্রত্যহ চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বৈভব, আমার বিপদ, প্রভৃতি চিন্তাতে মানুষ বিভোর হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কাহার সহিত কি সম্বন্ধ ছিল, মৃত্যুর পর আবার কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা মায়াচ্ছন্ন জীব নিমিষের জন্যও ভাবিয়া দেখে না—অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া স্ফীতবক্ষে জগতে বিচরণ করিতে থাকে।

জননী দেহ ত্যাগ করিলেন। যুবক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আকাশ ক্রমশঃ মেঘমুক্ত হইতেছিল। পবনদেবের সে আস্ফালন নাই, প্রকৃতি ক্রমেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ক্রমে গ্রামস্থ কতিপয় ব্যক্তি কুটীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা হেমচন্দ্রকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দুরন্ত শোকাবেগ কি উপশমিত হইবার? সংসারে যাহার অন্য কোন অবলম্বন নাই, কোলে টানিবার যাহার লোক নাই—তাহার কি সান্ত্বনালাভ সম্ভবপর? যুবক যতই মায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন, যতই নিজের দীনতার, সংসারে নিরবলম্বতার কথা মনোমধ্যে উদিত

হইতে লাগিল, ততই অধীর হইতে লাগিলেন। অবশেষে প্রতিবেশীরা আসিয়া নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। জননীর শবদেহ তীরস্থ করা হইল। চিতাবহ্নি যতক্ষণ জ্বলিল, ততক্ষণ যেন সেই চিতাগ্নির প্রকোপে হেমচন্দ্রের নয়নাশ্রু শুষ্ক হইয়া রহিল। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে হেমচন্দ্র যখন পুনরায় কুটীরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার শোকবেগ দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল। তিনি সমস্ত রাত্রি ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষে জগৎসংসার শূন্যময়। অসংখ্য তারকাপরিবেষ্টিত পূর্ণশশধর-বিরাজিত সুনীল নভোমণ্ডলের দিকে তিনি যখন চাহিলেন, দেখিলেন—সেই মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যেও যেন একটা বিষম অভাব নৃত্য করিতেছে। আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধানে কেবল শূন্যতা পরিদৃষ্ট হইল। সুজলা সুফলা বসুন্ধরাও শূন্যময় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া হেমচন্দ্র নিস্তেজ, অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে অবসন্নতা প্রগাঢ় হইল। যুবক দেখিলেন, তাঁহার জননী জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া তাঁহার ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন এবং মধুর স্বরে বলিতেছেন, "বাছা! আর কিসের জন্য এই ভগ্নকুটীরে অবস্থান করিবে? আমাদিগের চিরশত্রু, গ্রামের জমিদার তোমাকে পাইলে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। তুমি এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়ন কর।"

সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় হেমচন্দ্র সচকিতভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই নীরবতা, সেই শূন্যতা সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময়ী জননীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন—"মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে

কোন উত্তর পাইলেন না। এজগতে বুঝি প্রতিধ্বনিই মানবজীবনের সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে একমাত্র সহচরী।

যুবক উঠিলেন। গৃহস্থিত তৈজসপত্রাদির মধ্য হইতে যাহা কিছু আহরণীয়, তাহাই সঙ্গে লইলেন। জননী যে নামাবলী গায়ে দিয়া পূজা করিতেন, তিনি অতীব যত্নসহকারে তাহাও লইলেন। চিরদিনের মত বিদায় লইবার মানসে একবার গ্রামখানি এবং তৎপরে কুটীরখানির প্রতি চাহিলেন, তাহার পর—"কোথায় মা", বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতপাদবিক্ষেপে গ্রামত্যাগ করিলেন।

সকলই ফুরাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

এখন হেমচন্দ্রের একটু পরিচয় দিব। তাঁহার পিতার নাম দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়। তিনি গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দেহ, হাস্যপূর্ণ বদন, সদয় ব্যবহার, সাদর সম্ভাষণ সকলকেই প্রীত করিত। যিনিই তাঁহার সহিত কোন কার্য্যবশতঃ সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন নাই।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারে গৃহিণী ও একটী শিশুপুত্র ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার পুত্র যখন নবম বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন গ্রামস্থ জমিদার মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয়া দুহিতার সহিত বালকের বিবাহের প্রস্তাব করেন। মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কুল শীল তত ভাল ছিল না। কাজেই তাঁহার প্রস্তাবে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মতি দান করিতে পারেন নাই। ফলে এই হইল যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইল। ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটাটী পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া গেল। নানারূপ দুশ্চিন্তায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কাল আসিয়া সকল দুঃখের অবসান করিয়া দিল, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরও মনোহর চক্রবর্ত্তীর ক্রোধ প্রশমিত হইল না। তিনি পুনরায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা ভার্য্যার নিকট পূর্ব্ব প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বিধবা স্বামীর মনোভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনিও তাই জমিদার মহাশয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ক্রোধানল অধিকতর প্রজ্বলিত হইল। তিনি বিধবাকে নিরাশ্রয় করিয়া বাটী হইতে বিতাড়িত করিলেন। বিধবা রমণী কতিপয় সহৃদয় গ্রামবাসীর সাহায্যে গ্রামের প্রান্তদেশে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যিনি পূর্ব্বাপর সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি প্রবলের অত্যাচারে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, কালের তাড়নে এক্ষণে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। পুত্রের মুখ একটু মলিন হইলে যাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইত, সেই পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব, পরিচ্ছদের ক্লেশ স্বচক্ষে দেখিলেও বিধবা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ প্রতিকার করিতে পারিতেন না। ইহাকে নিয়তির পীড়ন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

পুত্র গ্রাম্যবিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন এবং সকালে সন্ধ্যায় ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই কষ্টে মাতা পুত্রে কালযাপন করিতেন। বিধবা পুত্রের মুখ দেখিয়াই প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যখন দুঃখ-দরিদ্রতায় অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন মাতৃ-ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া, মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেন। পুত্রের কষ্টে মাতার প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও সে ভাব সযতনে সংগোপন করত মাতা নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে পুত্রকে শান্ত করিতেন। বালক ইহাতেই স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেন। কিন্তু

নির্ম্মম কাল ইহাও সহ্য করিলেন না। যখন দুঃখস্রোত প্রবলবেগে আইসে; তখন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ফুটিয়া উঠে। বালকের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। জননী পীড়িতা হইলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ কবিরাজ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। জ্বরের প্রকোপ কিন্তু কিছুতেই প্রশমিত হইল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে রাত্রিতে বিধবার মৃত্যু হয়, সে দিবস কবিরাজ রোগিণীর নাড়ী টিপিয়াই ঘাড় নাড়িলেন; বাঁচিবার যে আর আশা নাই, তাহা বুঝিলেন, তথাপি তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বিরত হইলেন না। তাই হেমচন্দ্রকে ঔষধ আনিবার জন্য সেই প্রবল বাত্যাবৃষ্টিতেও কবিরাজের বাটীতে যাইতে হইয়াছিল।

মা মরিলেন, পুত্রও গৃহত্যাগ করিলেন। যে গ্রামে আজন্ম লালিত পালিত হইয়াছেন, সেই জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া চলিলেন। গ্রামে 'আপনার' বলিবার কেহ না থাকিলেও হেমের গ্রাম ত্যাগ করিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। একে মাতৃ-শোক, তদুপরি জন্মভূমিত্যাগজনিত দুঃখ,—তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। শূন্য মনে—ক্লিষ্ট বদনে, হেমচন্দ্র হরিহরপুর ত্যাগ করিলেন। গ্রামের কেহ জানিল না—তিনি কোথায় গেলেন।

তখনও ঊষা সমাগম হয় নাই, তখনও নীড় হইতে বিহঙ্গমকূজনে দিগন্ত মুখরিত হয় নাই, তখনও রজনীর কৃষ্ণাঞ্চল ধরিত্রীবক্ষ হইতে অপসারিত হয় নাই। শীতল সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল। জীবনের অবসান কালে অনুপমা সুন্দরীর অপরূপ রূপমাধুরী যেরূপ শীর্ণ হইয়া থাকে, ফুল্ল কৌমুদীস্নাত রজনীও সেইরূপ অবসানের পূর্ব্বে মলিন হইয়া আসিয়াছিল। সেই অনুজ্জ্বল রজত-জ্যোৎস্নায় বৃক্ষশীর্ষ, অট্টালিকাদির মস্তক উদ্ভাসিত হইতেছিল। হেমচন্দ্র সেই সময়ে গ্রাম

ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না—মাতাপিতাহীন শোকাচ্ছন্ন যুবক উদ্‌ভ্রান্তভাবে কোথায় কাহার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

-*•*-

মনোহর চক্রবর্ত্তী।

প্রাতে কুটীর সন্নিধানে গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া দেখিল, শূন্য কুটীর পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে প্রথমে মনে করিল, হেমচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে হয়ত, স্থানান্তরে গিয়াছেন, এখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কাজেই তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় সকলে বসিয়া রহিল। কিন্তু ক্রমেই প্রভাত সূর্য্য দেখা দিলেন। ক্রমেই সূর্য্যালোকে জগত হাসিতে লাগিল। রজনীসহচর শিশিরবিন্দু কুসুমকুলে, বৃক্ষপত্রে আশ্রয় লইয়াছিল—নিশাবসানে তাহারা প্রিয়াবিরহে পত্রকুঞ্জ হইতে একে একে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শিশিরবিন্দুর কি রূপ! বালার্ক কিরণসম্পাতে শিশিরবিন্দুর রূপ মাধুরী যেন উথলিয়া উঠিল। তাহারা স্ব স্ব সৌন্দর্য্য-গরিমা দেখাইয়া যেন তরুণ অরুণকে বলিতে লাগিল, 'আমাদিগের এত রূপ ভোগ করিবার তুমি উপযুক্ত পাত্র নহ।' পাছে ভানুদেব তাহাদিগকে হরণ করেন, নিজ করবিস্তারে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোষণ করেন, এই আশঙ্কায় তাহারা ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। এমনই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় হেমচন্দ্র জমিদার মনোহর চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন।

গ্রামের লোকেরা অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও যখন হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইল না, তখন তাহারা সন্দেহাকুলচিত্তে কুটীরাভ্যন্তরে

অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। দেখিল, কুটীরস্থ দ্রব্যাদি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে—কোন কোন দ্রব্য নাই। কুটীরের অবস্থা দেখিয়া সকলের ক্রমেই প্রতীতি জন্মিল যে, যুবক কুটীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ভাবিল, যুবকের দুরবস্থার কথা শুনিয়া অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ জমিদার মহাশয় তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। কেহ বা অনুমান করিল, স্বার্থসিদ্ধি নহে, দয়াপরবশ হইয়া জমিদার মহাশয় এই কার্য্য করিয়াছেন। ফলতঃ ভূম্যধিকারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী যাওয়াই সকলে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল। কার্য্যও তদনুরূপ হইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী। মুসলমান রাজত্ব হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লোকজন দেশদেশান্তর হইতে—কত হাট, মাঠ, ঘাট হইতে—লাঠির প্রভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ধন ভাণ্ডারপূর্ণ করিত। কিন্তু সে কাল ত আর নাই। ইংরাজের সুশাসনে দস্যু তস্করের প্রকোপ অনেক কমিয়াছে—অত্যাচারী জমিদারদিগের বাটীতে "চূণের ঘর" * আর দেখা যায় না। ভূস্বামীর প্রজার উপর, প্রবলের দুর্ব্বলের উপর নিগ্রহ প্রতিরোধ করণাভিপ্রায়ে ন্যায়পরায়ণ ইংরাজরাজ নানারূপ বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেও অত্যাচার যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। সেই নিমিত্তই মানাইর চক্রবর্ত্তী নানারূপ কৌশলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* পূর্ব্বে জমিদারদিগের বাটীতে কারাগারকে "চূণের ঘর" বলিত। এই কারাগারে চূণ রাখা হইত। চূণের তীব্র ঘ্রাণে বন্দীর কষ্টের পরিসীমা থাকিত না।

মনোহর চক্রবর্ত্তী যখন শুনিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভার্য্যাও ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন হেমচন্দ্রকে পাইবার আশা তাঁহার পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তিনি মৎস্যলোলুপ মার্জ্জারবৎ যুবকের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। পরদিবস নানারূপ সদয় ব্যবহারে যুবককে পরিতুষ্ট করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিবার জল্পনাও যে তিনি করেন নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রাতঃকালে বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ক্রমে ক্রমে দুই এক জন কর্ম্মচারীও আসিতে লাগিল। ক্রমে দেওয়ানজী আসিলেন। দেওয়ানের নাম রত্নাকর ঘোষ। রত্নাকর রত্নাকরই বটেন! যেমন দেবতা, তেমনই বাহন! দেওয়ান আসিয়া প্রভুর পদধূলি গ্রহনান্তর করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আদেশ'।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "দেওয়ানজী, তুমি জান, দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গত রাত্রিতে মাতৃহীন হইয়াছে। আমি সেই ছেলেটীর সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার বাসনা বহুপূর্ব্ব হইতে করিয়াছি, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। দীনদয়াল কুলের মুকুটী,—স্বভাব। আমি বংশজ, সুতরাং আমার কন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ হইলে তাহার কুল নষ্ট হইবে, এই হেতুবাদে দীনদয়াল তাহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলেন। কুল যে এখন বাক্সের ভিতর মূর্খ দীনদয়াল তাহা বুঝিলেন না। কাজেই মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সর্ব্বস্ব হারাইলেন। এখন তাঁহার বিধবা স্ত্রীও ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ভগবান প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি কৌশলক্রমে দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রকে আমার বাটীতে আনয়ন কর। প্রথমে মিষ্টবচনে তুষ্ট করিতে

প্রয়াস পাইবে। যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে বল প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইও না। বিজ্ঞেরা বলিয়া গিয়াছেন, ছলে বলে কৌশলে বুদ্ধিমানেরা কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকে”।

দেওয়ানজী। আমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। সেই সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগ পর্য্যন্ত একই নিয়মে সংসার চলিয়া আসিতেছে। রাজারা সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই নীতিচতুষ্টয় অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। যাহা বৃহৎ রাজ্য সম্বন্ধে প্রয়োজ্য, তাহা ক্ষুদ্র সংসার পরিচালনায়ও সমান ভাবে প্রয়োজ্য।

চক্রবর্ত্তী। বেশ, বেশ! এমন না হলে কি আমার দেওয়ান হইতে পার! দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের বড় গর্ব্ব ছিল। তাঁহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে, মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগত আত্মাও দেখিতে পাইবে, আমার সঙ্কল্প অক্ষুন্ন রহিল। দীনদয়াল আমার যে অপমান করিয়াছেন, মরিলেও বুঝি তাহা ঘুচিবে না। সর্ব্বস্বান্ত হইতেও প্রস্তুত আছি, তথাপি দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হওয়া চাই।

দে। যদি নির্ভয়ে বলিবার আদেশ দেন, তাহা হইলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার মনের ধাঁধাঁটা ঘুচাইয়া লই।

চ। কি বলিবে বল?

দে। ধনে মানে আপনার সমতুল্য এ গ্রামে কে আছে? সেদিন বিল্ব গ্রামের জমিদার কাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন! কাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। মান, মর্য্যাদা কিছুতেই তিনি ন্যূন নহেন। তাঁহার পুত্রও সুরূপ। সে

প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আপান একটা অনাথ বালকের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে এত সমুৎসুক হইয়াছেন কেন?

চ। এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝিতে পারিলে না? ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ মুখোপাধ্যায়ের কুল শীল কাশীশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ আমার জেদ। লোকে কি বলিবে? বলিবে, মনোহর চক্রবর্ত্তী নামেই জমিদার, কোনই ক্ষমতা তাঁহার নাই। একটা সামান্য গ্রামবাসীকে শাসন করিতে পারিলেন না। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখোপাধ্যায় আমার যে অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ আমি লইবই লইব।

জমিদারপুঙ্গবের বাক্যাবসান হইতে না হইতে কতিপয় গ্রামবাসী আসিয়া সংবাদ দিল, মুখোপাধ্যায়-পুত্রকে কুটীরে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

যদি সেই সময়ে সহসা বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলে জমিদার যত বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হইতেন, এই সংবাদে ততোধিক হইলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "গ্রামত্যাগ করিয়া বালক আর কোথায় যাইবে? হয়ত কোনস্থানে লুকাইয়া কাঁদিতেছে।"

গ্রামবাসীরা বলিল, তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, কিন্তু কোন সন্ধানই পায় নাই। কুটীরেও কতকগুলি তৈজসপত্র পাওয়া যাইতেছে না।

জমিদার মহাশয় গ্রামবাসীদিগের কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি বালকের অন্বেষণার্থ চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

জমিদারের লোকেরা ক্রমেই হতাশ হইয়া ফিরিল। বালকের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। মনোহর চক্রবর্ত্তী তখন ভাবিতে

লাগিলেন, সংসারে কেন এমন হয়? মানুষ যাহা করিবে স্থির করে, কোন্ অজ্ঞাতশক্তি তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে? সমস্তই উল্টাইয়া যায় কেন? কৃতিত্ব, মনুষ্যত্ব সকলই কথার কথা। অদৃষ্ট-লিপিই বুঝি সর্ব্বত্র প্রবল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হেমলতা।

"হিঃ—পোড়ারমুখী—মর্—মর্—মর্।"

"কেন পিসিমা, কি করেছি?"

"করবি আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ড!"

"বল না পিসিমা, কি দোষ করেছি?"

"ওরে, তুই দেখ্‌ছি আমাকে পাগল ঠাওরেছিস্! নইলে আমার সঙ্গে ঠাট্টা?"

"পিসিমা আমি কি ঠাট্টা করলুম? তোমার পায়ে পড়ি রাগ ক'রোনা।"

"চোপ্‌রাও হতচ্ছাড়ি!"

হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকা মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার নির্ম্মল শুভ্র স্বচ্ছ চিত্তে এখনও সংসারের কালিমা স্পর্শ করিতে পারে নাই। সরলা বালিকা যেমনই ধীরা, নম্রশীলা, তেমনই মিষ্টভাষিণী, সৌন্দর্য্যশালিনী। হেমলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, বুঝি স্বর্গের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য একাধারে প্রকটিত করিয়া বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

হেমলতা মাতাপিতার অত্যন্ত আদরের কন্যা ছিল। তাহার পিতা কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। সেই সম্পত্তির যৎকিঞ্চিৎ আয় হইতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। মাতা কমলমণিও স্বামীর সম্পূর্ণ অনুগামিনী ছিলেন।

গ্রামে কাহারও কোনরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইতেন। এমন অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে, যে দিনে কৃষ্ণকিশোর সস্ত্রীক উপবাসী থাকিয়া অনশনক্লিষ্ট দুস্থ ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছেন। কৃষ্ণকিশোর দরিদ্র হইলেও এবংবিধ মহত্বগুণে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

এহেন কৃষ্ণকিশোরের সহোদরা দিগম্বরী ঠাকুরাণী কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কর্কশভাষিণী, রুক্ষস্বভাবা ছিলেন। সামান্য কারণে বিশেষ উত্তেজিতা হইতেন। এতদ্ব্যতীত, স্বার্থপরতা তাঁহার অস্থিমজ্জায় গ্রথিত ছিল।

কৃষ্ণকিশোর বাবুর হেমলতা একমাত্র কন্যা—অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। সুতরাং হেমলতা জনক জননীর অত্যন্ত আদরের দুহিতা। এত আদর যত্ন সত্ত্বেও হেমলতা অতীব মধুর প্রকৃতির বালিকা ছিল। সে কখন কাহারও সহিত কলহ করিত না। সর্ব্বদাই হাস্যমুখে মধুর সম্ভাষণে সঙ্গিনীগণকে আপ্যায়িত করিত।

হেমলতা কাঁদিতেছে দেখিয়া কমলমণি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। ইহাতে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি কমলমণিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এত অহঙ্কার ভাল নয়! মেয়ে সকলেরই হয়, সকলেরই আছে। কি কর্‌বো, পোড়া বিধাতাকে যদি দেখ্‌তে পেতুম, ত তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতুম। ওলো! অত অহঙ্কার করিস্ নি। আমার ছেলে মেয়ে নেই বলে কি আমাকে এই রকম করে টিটকিরি দিতে হয়!"

কমলমণি ননদিনীর প্রকৃতি বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়াই বিরক্ত বা দুঃখিত হইলেন না। মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "দিদি! ও ত

তোমারই মেয়ে। আমি কি তোমাকে টিট্‌কারী দিতে পারি? আমি যে তোমার দাসী।" এই বলিয়া কমলমণি হেমলতাকে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। হেমলতা তাহাই করিল, তথাপি দিগম্বরীর তর্জ্জন গর্জ্জন থামিল না।

এই সময়ে কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিতে হাসিতে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। কমলমণি ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেমলতাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকটে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বলিলেন, "দিদি! তোমার কেবল হেমলতা মেয়ে ছিল, এখন আবার একটী ছেলে হইল!"

দিগম্বরী ঠাকুরাণী ভ্রুকুটী করিয়া সহোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহোদরার মুখের ভাব দেখিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিলেন—প্রলয়াবসানের অব্যবহিত পরেই প্রকৃতির যে ভাব হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠার বদনমণ্ডলে সেই ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখ শুকাইল। তিনি জ্যেষ্ঠার প্রসন্নতা সম্পাদনার্থ বলিলেন, "আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঘোষেদের পুষ্করিণী হইতে মস্ত একটা রুই মাছ ধরিয়াছেন। শুধু মাছ নহে, সেই সঙ্গে আবার একটী সুন্দর বালকও পাইয়াছেন—"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাক্যাবসান হইতে না হইতেই দিগম্বরী ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যারে কেষ্ণা—তুইও কি আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর্ত্তে আরম্ভ করেছিস্? পুকুরে কি ছেলে পাওয়া যায়, যে মাছের সঙ্গে উঠবে?

কৃষ্ণ। (ত্রস্তভাবে) আমি তা বলি নাই। মাছ ধরা পড়িবার পর একটী বালক দীনহীনবেশে পাড়ের ধার দিয়া যাইতেছিল। গ্রামে অপরিচিত বালককে দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে

ডাকিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক উত্তরে বলিল যে, সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ, স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতেছে। কলিকাতাতেও তাহার কেহ আত্মীয় স্বজন নাই। বালকের দুই দিবস আহার হয় নাই। সে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে যত্ন করিয়া লইয়া আসিতেছেন।

আমরা এখানে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু পরিচয় দিব। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কুলীন শিরোমণি! দয়া করিয়া ৮০টী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দিগম্বরী ঠাকুরাণী অন্যতমা। তিনি যখন যে শ্বশুরালয়ে গমন করিতেন, তখন সেই শ্বশুর বা শ্যালকের নিকট যথেষ্ট অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিতে ত্রুটী করিতেন না! কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও দিগম্বরী ঠাকুরাণীর জন্য তিনি ভগিনীপতির মনস্তুষ্টি সাধনে কোন বিষয়ের ত্রুটী করিতেন না। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও দিগম্বরীর প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন।

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় মৎস্য ও হেমচন্দ্রকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। দিগম্বরী মৎস্য দেখিয়াই সকল ভুলিলেন, হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল না। তিনি সত্বর মৎস্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইলেন।

কমলমণি হেমচন্দ্রকে দেখিলেন। হেমের সেই কমনীয় কান্তি দেখিয়া কমলমণির কোমল হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। করুণাই স্নেহের আকর; কাজেই হেমকে কমলমণি অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন, মনস্থ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

-*।*-

পরামর্শ।

কি জানি কেন, হেমচন্দ্রকে দেখিয়া অবধি দিগম্বরী ঠাকুরাণীর প্রকৃতি অধিকতর রুক্ষ হইল। হেমচন্দ্র তাঁহার চক্ষুঃশূল হইলেন। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাবিয়াছিলেন, নিঃসন্তান ভার্য্যা দিগম্বরী হেমচন্দ্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন, পুত্ররূপে হেমচন্দ্রের ন্যায় "সোণার চাঁদ" বালককে পাইয়া পরিতুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না, বিধাতা বাদ সাধিলেন। যখন হেমচন্দ্রকে সেই মৎস্যের ঝোল পরিতোষরূপে খাইতে দেখিলেন, তখনই দিগম্বরীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। দিগম্বরী ঠাকুরাণী ভাবিয়াছিলেন, মৎস্যের কাঁটাটা পর্য্যন্ত ফেলিবেন না, সমস্তই উদরসাৎ করিবেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল, হেমচন্দ্রের আগমনে অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। শুদ্ধ তাহাই নহে, হেমচন্দ্রকে পরিতোষরূপে আহার করাইবার জন্য দরিদ্র কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভগিনীপতি রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। কৃষ্ণকিশোরের অবস্থা সচ্ছল না থাকায় নানারূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় নাই। সে দিনের সম্বল কেবল সেই মৎস্যটা। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণে মৎস্য না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্রও আদরে বশীভূত হইয়া ভোজনে আদৌ লজ্জা বা সঙ্কোচ প্রকাশ করিলেন না। ইহাতেই দিগম্বরী ঠাকুরাণীর তাঁহার উপর ক্রোধের সঞ্চার হইল।

যাহা হউক, আহারাদি সমাপনান্তে যখন কমলমণি স্বামী সকাশে আগমন করিলেন, তখন কমলমণির মুখে উৎকণ্ঠার ভাব প্রকটিত ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি বল ত ?"

ক। কি আর ব্যাপার ? দেখ, ছেলেটীকে দেখে পর্য্যন্ত উঁহাকে ছেলের মতন পালন করিতে ইচ্ছা হ'য়েছে। আচ্ছা ! উঁহার জাতি কুল কিছু জান কি ?

কৃ। উঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমাদের পাল্টী ঘর বলিয়াই মনে হয়।

ক। হরি কি তাই কর্ব্বেন ? যদি আমাদের পাল্টী ঘর হয়, তা'হলে আমি পাঁচ পয়সার হরির লুট দিব। হেমলতার বিয়ের জন্য আমরা যেমন চিন্তিত হয়েছিলাম, ভগবান্ তেমনিই সোণার চাঁদ পাত্র জুটিয়ে দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। গিন্নি ! তুমি কি পাগল হইলে ? কোথাও কিছু নাই, ইহারই মধ্যে হেমলতার বিবাহ স্থির করিতেছ ! এ যে আকাশে সৌধ নির্ম্মাণ !

কমল। কেন ? ছেলেটীর বাসস্থানের ত সংবাদ পেয়েছ। সেখানে লোক পাঠালে উঁহার সম্বন্ধে সকল তথ্যই ত জানা যাবে।

কৃষ্ণ। তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু বিবাহ বলিলেই ত বিবাহ হয় না। কুলশীলই যেন মিলিল, তারপর অবস্থাও ত দেখিতে হইবে।

কমল। অবস্থায় কি আসে যায় ? আজ যে ধনী আছে, কাল সে ভিখারী হচ্ছে। আজ যে পর্ণকুটীরবাসী দীন আছে, কাল সে প্রাসাদভোগী লক্ষপতি হচ্ছে। আমার পুত্র নাই, ছেলেটী আমার

পুত্রস্থানীয় হ'বে। তোমাকে মিনতি করি, তুমি আজই একজন লোককে উঁহাদের গ্রামে পাঠিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। যো হুকুম মহারাণি! গোলাম ত হুকুম তামিল করিতেই আছে।

কমল। ওকি কথা?—অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমি যে তোমার দাসী। তুমি দয়া করে আমাকে ভালবাস, তাই আমি সাহস করে কথা বলি। হেমলতা বিবাহযোগ্যা হয়েছে। কুলে শীলে, রূপে গুণে ছেলেটী উত্তম। আমাদের অবস্থার লোকের আজ কাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কিরূপ কষ্টকর হয়েছে, তা সকলেই জানে। আমাদের ভিটা বাঁধা দিয়েও, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করেও যা হ'বে, তা খরচ করেও ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না। এরূপ স্থলে যদি বিনা ব্যয়ে হেমচন্দ্রের মতন ছেলেটীকে পাওয়া যায়, তা কি মন্দ?

কৃষ্ণ। আমার আবার মন্দ কি হইতে পারে? যাহার গৃহে কমলমণির ন্যায় লক্ষ্মী বিরাজিতা, তাহার কি কিছুর অভাব থাকিতে পারে? আমি তোমার পরামর্শই গ্রাহ্য করিলাম, আজ লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া কমলমণি আশ্বস্তা হইলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে বিরাজমান। কুলায় বসিয়া বিহঙ্গমকুল কাকলীতে দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল। অদূরে তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষশীর্ষে পত্রাবলী বায়ুসঞ্চালনে মাথা নাড়িতেছিল। মাঠে রাখাল বালকগণ বৃক্ষতলে সুশীতল ছায়ায় বসিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতেছিল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে স্বেচ্ছায় কে দগ্ধ হইতে চাহে? কাজেই এই সময়ে গ্রামে অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব গৃহে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিল।

কমলমণি স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। কমলমণি তখন ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা কোথায় ? গার্হস্থ্য সকল কার্য্যই তাঁহাকে স্বহস্তে করিতে হইত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরিণয়।

হেমলতার সহিত হেমচন্দ্রের বিবাহ স্থির হইল। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য পরিচয় অবগত হইয়া কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহা আহ্লাদিত হইলেন। হেমচন্দ্রের রূপ, গুণ, স্বভাব ও ব্যবহার প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া সকলেই এই উদ্বাহকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেবল বিরোধী হইলেন—দিগম্বরী ঠাকুরাণী। তিনি যে কি কুক্ষণে হেমচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। যে দিবস হেমচন্দ্র প্রথমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভিটায় পদার্পণ করেন, সে দিবস রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় যদি মাছটী ধরিয়া না আনিতেন, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের উপর সম্ভবতঃ দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ক্রোধের সঞ্চার হইবার কোন কারণই থাকিত না। অভ্যাগত অতিথিকে যেরূপ সৎকার করিতে হয়; মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই করিয়াছিলেন। এদিকে হেমচন্দ্রেরও জঠরজ্বালা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাই তিনি ভোজনে লজ্জা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। হেমচন্দ্রের জঠরজ্বালা যতই নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল, দিগম্বরী ঠাকুরাণীর গাত্রজ্বালা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদবধি হেমচন্দ্রকে দিগম্বরী ঠাকুরাণী দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

ইহার উপর আবার তাহারই করে স্বর্ণলতা সমতুল্যা হেমলতাকে অর্পণ করিবার কথা স্থির হইল। দিগম্বরী বুঝিলেন, তাঁহার

আহার্য্যের অপর একজন অংশী বৃদ্ধি পাইল। দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ন্যায় কোন স্ত্রীলোক ইহাতে কি স্থির থাকিতে পারেন? আমরা জানি না, পাঠিকাদিগের মধ্যে দিগম্বরীর ন্যায় কোন রমণী আছেন কি না। থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই দিগম্বরীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিবেন। যে দিবস হেমচন্দ্র বাসভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিবস তিনি গ্রামান্তরে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। তথায় দশ দিবস অবস্থান করিয়া আদ্যকৃত্যাদি সমাপনান্তে তিনি কলিকাতায় যাইবার মানসে বহির্গত হয়েন। পথিমধ্যে রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল। হেমচন্দ্রের কালাশৌচ এক বৎসর থাকিবে। বৎসরান্তে হেমচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইবে, ইহাই ধার্য্য হইল।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকাল হেমচন্দ্রকে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর নিকট নানারূপে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। কেবল কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় পত্নী কমলমণি এবং সেই চন্দ্রমুখী হেমলতার জন্য তিনি অবমাননা লাঞ্ছনা বিস্মৃত হইয়া এক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন।

যথাসময়ে হেমচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইল। এই বিবাহে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। হেমলতা ও হেমচন্দ্রের মধ্যে একত্রবাসজনিত যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, চন্দ্রের ন্যায় তিল তিল তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয়েই মনে করিল, বুঝি মর্ত্তে স্বর্গসুখ আসিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*০*—

ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

বিবাহের পর আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। চৈত্র মাস, মধুর বসন্তে দিগন্ত উদ্ভাসিত। কিসলয়শোভিত চ্যূত-বৃক্ষ-শাখে পিকবর বসিয়া মনের আনন্দে কুহুরবে বিরহিজনের হৃদয়ে সন্তাপ উদ্রেক করিতেছে। মধুকরনিকর পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে অনুরাগভরে মধু আহরণার্থ মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে প্রধাবিত হইতেছে। মলয় মারুত কুসুম-সৌরভ হরণ করিয়া যুবতীজনের অঙ্গসেবনে ব্রতী হইয়াছে। প্রকৃতি হাস্যময়ী—সকলেই আনন্দে বিভোর। এহেন মধুমাসে মধুর বসন্তে কিন্তু স্বর্ণপুর গ্রামখানি নীরব, নিস্তব্ধ। গ্রামে লোকের চলাচল নাই, সকলেই যেন প্রাণভয়ে ব্যাকুল। স্বর্ণপুরে বিসূচিকা দেবী মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। গ্রামে এমন বাড়ী নাই, যে বাড়ীতে অন্ততঃ ২।১ জন লোকও বিসূচিকায় না মরিয়াছে। সকলেই সশঙ্ক—কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে।

কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় পত্নী কমলমণি একই দিবসে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। গ্রাম্য কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আর আশা নাই। হেমচন্দ্র ও হেমলতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সেই যে প্রবলা, মুখরা দিগম্বরী ঠাকুরাণী—তাঁহারও নেত্রনীরে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। দিগম্বরী ঠাকুরাণীর সে চাঞ্চল্য নাই—বদনমণ্ডল দুঃখ ও চিন্তাভারাক্রান্ত।

ক্রমেই কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক একই সময়ে কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় পত্নী প্রাণত্যাগ করিলেন। সুখ চিরদিন কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, হেমচন্দ্রের তাহাই হইল। হেমচন্দ্র হয়ত মনে মনে ভাবিলেন,

"অভাগা যদ্যপি চায়,
সাগর শুকায়ে যায়।"

হেমচন্দ্রের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। যেদিন তিনি মাতৃহীন হইয়া সংসারে অবলম্বনশূন্য হইয়াছিলেন, সে দিবস তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই বিস্তৃত সংসার-ক্ষেত্রে সহায়হীন, সম্পদহীন, লক্ষ্যহীন, পথহারা পান্থের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে জীবনাতিবাহন করিতে হইবে। সে দিন কাটিয়া গেল। তাঁহার ভাগ্যাকাশে যে জলদজাল একত্রিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইল। ক্রমে সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল। ব্যাতাবৃষ্টি-নিপীড়িত রজনীর অবসানে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে রক্তিমরাগরঞ্জিত সূর্য্যোদয় যেরূপ লোকের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকে, হেমচন্দ্রের সহিত হেমলতার পরিণয়ে হেমচন্দ্রের জীবনাকাশে তদ্রূপ আনন্দবর্দ্ধক সুপ্রভাত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। আবার ঘোর ঘনঘটা দেখা দিল—আবার কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলমণির মৃত্যুতে হেমচন্দ্র দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। এবার বিভ্রাট অধিকতর বলিয়া বিবেচিত হইল, কারণ, পূর্ব্বে হেমচন্দ্র একাকী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার ভাগ্যসূত্রের সহিত হেমলতার ভাগ্যসূত্র বিজড়িত হইয়াছে, কাজেই হেমচন্দ্রকে আকাশ পাতাল ভাবিতে হইল।

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোদরপ্রতিম জ্ঞান করিতেন। কাজেই হেমলতা তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী

ছিল। তিনি কলিকাতায় হেমচন্দ্র ও হেমলতাকে লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কারণ, হেমচন্দ্রের একটা চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিলেন। তিনি স্বয়ংও কোনরূপ ব্যবসায় করিয়া দিনযাপন করিবেন স্থির করিলেন।

হেমচন্দ্রের মুখ মলিন দেখিয়া এক দিবস রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন "বাপু! সংসারে অধীর হইলে কোন কার্য্য হয় না। যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগের সম্বন্ধেই ভাবিতে হইবে। এই সংসার—কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে যেরূপ বীজ বপন করিবে, তদ্রূপ ফল ফলিবে। আমরা যদি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন কোথা হইতে হইবে।"

হেম। আজ্ঞে, আমিও তাই ভাবিতেছি। এ সংসারে আপনি ব্যতীত আমার আর কে অবলম্বন আছে? আমি সম্পূর্ণ সংসারানভিজ্ঞ, কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় নাই। কোথায় যাইলে, কি করিলে, অর্থোপার্জ্জন হইবে, কিছুই জানি না। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

র। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, এ গ্রামে অবস্থান করিলে আমাদিগের আহার জুটিবে না। আমাদিগের এমন কোন সম্পত্তি নাই, যাহার আয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমি সেইজন্য মনে করিতেছি, এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তথায় আমার পরিচিত একজন ধনাঢ্য বন্ধু আছেন। তিনি হাটখোলায় ব্যবসায় করেন। তথায় তোমার চাকুরী হইতে পারে। আমিও একটা কারবার করিব। তোমার ইহাতে কোন আপত্তি আছে কি?

হে। আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য করিব। আপনি ব্যতীত আমায় আর অভিভাবক কে আছে?

"তবে তাহাই হইবে" বলিয়া রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুভদিন দেখিয়া রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সপরিবারে স্বর্ণপুর ত্যাগ করিলেন। স্বর্ণপুর ছাড়িয়া যাইতে রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার যে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা স্থির বলিতে পারি। কারণ, স্বর্ণপুরে রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় অনেক দিন আমোদে আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়াছেন।

আর দিগম্বরী ও হেমলতা? তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। যে দিগম্বরীকে সমগ্র স্বর্ণপুরবাসী ভয় করিত, যাহার কোমলভাব কেহ কখন দেখিতে পায় নাই, কলহ বিবাদে যে সকলের ভয়ের পাত্রী হইয়াছিল সেই দিগম্বরী ঠাকুরাণীরও অশ্রুধারা বহিয়াছিল।

হেমচন্দ্র ও হেমলতা দিগম্বরী ঠাকুরাণীর সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দিগম্বরীর প্রকৃতি পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। দিগম্বরী কিছুতেই সন্তুষ্টা হইতেন না হেমচন্দ্র যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিতেন, তাহাই দিগম্বরীকে দিতেন, কিন্তু দিগম্বরী ঠাকুরাণী তাহাতেও হেমচন্দ্রের উপর প্রসন্ন হইতেন না। অনেক সময় এমন হইত, দিগম্বরীর বাক্যযন্ত্রণায় হেমলতা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। হায়! যে বালিকা কত আদরে, কত যত্নে পিতৃমাতৃ ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বালিকা অযথা তিরস্কারে, অন্যায় ব্যবহারে মর্ম্মক্লিষ্ট হইয়া নিভৃতে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ক্রোধের প্রধান কারণ, হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রকে যখনই খাইতে দিতে হইত, তখনই দিগম্বরী ঠাকুরাণীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইত। দিগম্বরী প্রাণ ধরিয়া হেমচন্দ্রকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারিত না। ইহাতে হেমলতার অত্যন্ত কষ্ট হইত। কোন কোন দিন হেমলতা মুখ ফুটিয়া পিসিমাকে এ সম্বন্ধে অনুযোগ করিত। তাহাতেই পিসি মা ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমগ্র জগৎকে রসাতলে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিত। তখন গত্যন্তর নাই দেখিয়া বালিকা কাঁদিয়া আকুল হইত। হেমচন্দ্র যে এ ব্যাপার ক্রমশঃ অবগত হন নাই, আমরা তাহা বলিতে পারি না! তিনি প্রথমে হেমলতাকে শান্ত করিতেন, পিসিমাকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। দিগম্বরী ঠাকুরাণীর কুব্যবহারে হেমচন্দ্রেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। হেমচন্দ্র বারংবার হেমলতাকে পৃথক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া হেমলতা কাঁদিত, কিন্তু কোন উত্তর দিতে

পারিত না। কয়েকবার এইরূপ হওয়ার পর হইতে হেমচন্দ্র এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই কহিতেন না।

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর রোগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেই দিগম্বরীর ঝঙ্কারে বাটীতে লোক তিষ্ঠান দায় হইয়া পড়িত। ইহাতে হেমচন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। যতক্ষণ তিনি বাটীর বাহিরে থাকিতেন, ততক্ষণ তিনি যেন শান্তিতে থাকিতেন। এইরূপে দিগম্বরীই হেমলতার অদৃষ্টাকাশে ধূমকেতুরূপে উদিত হইল। হেমলতার সুখশান্তি দিগম্বরীর প্রভাবে ক্রমেই বিনষ্ট হইবার সূচনা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব সংঘটন।
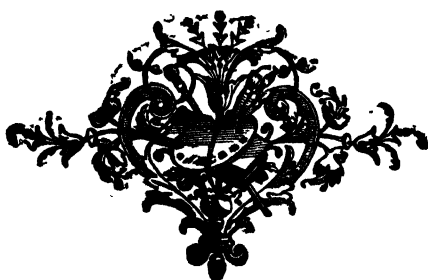
পাঠক! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমরা বহুদিন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। মনোহর চক্রবর্ত্তী কি প্রকৃতির লোক, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্র তাঁহার কবলমুক্ত হওয়ায় তাঁহার আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। যাহার জন্য তিনি দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের সর্ব্বনাশ সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, যাহার জন্য দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের বিধবা ভার্য্যাকে পথের ভিখারিণী করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, সেই হেমচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন হইয়া অবশেষে তাঁহার সকল আশাই বিনষ্ট করিল, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? মনোহর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় লোকের এরূপ অবস্থায় হেমচন্দ্রের উপর বিজাতীয় ক্রোধের উদ্রেক হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোহর চক্রবর্ত্তী হেমচন্দ্রকে পাইবার জন্য নানা দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার লোকজন হেমচন্দ্র-লাভে বিফলপ্রযত্ন হইল, তখন তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া হেমচন্দ্রের অনুসন্ধানে স্বয়ং বহির্গত হইবেন স্থির করিলেন। তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। মনোহর চক্রবর্ত্তী স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রথমে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাসনা—কলিকাতায় হেমচন্দ্রের কোন সংবাদ না পাইলে পশ্চিমোত্তরে কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন।

"শাস্ত্রে বলে, যত্নে যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কাহারও দোষ দিতে পারা যায় না। সুতরাং কার্য্যসিদ্ধির মূলেই যত্নের প্রয়োজন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও যত্নের অভাব হয় নাই। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তী যথাসময়ে কলিকাতায় আগমন করিলেন। বাগবাজারে তাঁহার এক আত্মীয় থাকিতেন। তাঁহারই বাটির নিকটে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাসা ভাড়া করিলেন। মফস্বলের জমিদার, কলিকাতায় আসিয়াছেন, সুতরাং বৈভব প্রদর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবলা হইয়াছিল। এরূপ হইয়াও থাকে। মফস্বলের অনেক জমিদার কলিকাতায় আসিলে পাছে কেহ তাঁহাদিগকে "পাড়াগেঁয়ে" বলে, এই আশঙ্কায় চাল চলন অবস্থানুরূপ না করিয়া বরং অনেক বৃদ্ধি করিয়াই থাকেন। কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করাও, তাঁহাদিগের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই দল পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাসায় দাস দাসী, আমলা কারপরদাজ, সহিস কোচম্যান প্রভৃতির ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল। তিনি সায়াহ্নে ল্যাণ্ডো ফিটান প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় মফস্বলের ধনী লোকের সমাগম হইলে মধুপদলের ন্যায় শালওয়ালা, বেনারসী বস্ত্র-বিক্রেতা, জহুরী প্রভৃতির ভিড় লাগিয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

এদেশে সুরাসেবন, বেশ্যাগমন অনেক বড়লোকের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেন উহা না করিলে বড়লোকত্ব প্রকাশ পায় না—উহাতে ক্রটী থাকিয়া যায়। দেশের নৈতিক দুর্গতির পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এই শ্রেণীর ধনকুবের-তনয়েরা ঐরূপ অসদাচরণকে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিবেচনা

করে না। ইহারা স্ফীতবক্ষে সমাজে বিচরণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। ইহা অপেক্ষা অধঃপতনের বিশিষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সমাজের শাসন অক্ষুণ্ণ থাকিলে, নীতি-বল অটুট থাকিলে, এই শ্রেণীর পাষণ্ডেরা কখনই সমাজে আদৃত হইত না এবং দশ জনে ইহাদের তোষামোদ করিতেও সাহসী হইত না।

একদা সায়াহ্নে মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় জুড়ীগাড়ী চড়িয়া বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। চিৎপুর রোড দিয়া তাঁহার গাড়ী দ্রুতবেগে যাইতেছে। চিৎপুর রোড লোকে লোকারণ্য। সেই জন-সাগর ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গাড়ী প্রধাবিত। হঠাৎ তাঁহার ঘোটকদ্বয়ের সম্মুখে একটী লোক পতিত হইল। যেরূপ অবস্থা ঘটিল, তাহাতে ঘোটকের পদাঘাতে এবং শকটের নিষ্পেষণে লোকটীর মৃত্যু স্থিরনিশ্চয় বলিয়া দর্শকমাত্রেরই ধারণা হইল। সকলেই "হাঁ হাঁ" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। শকটচালক অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী ছিল। সে প্রাণপণে অশ্বের বল্গা টানিয়া ধরিল। অশ্বদ্বয়ের গতিরোধ হওয়ায় আসন্ন মৃত্যু হইতে লোকটী রক্ষা পাইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথমাবধিই লোকটীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার শরীরে দামিনীতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। তিনি নিমিষমধ্যে স্বীয় শকট হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া লোকটীকে ধরিয়া ফেলিলেন। লোকটীর অঙ্গে কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে কি না, অতি নিকট-আত্মীয়ের ন্যায়, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটীও "অতি" বিনয়নম্রবচনে উত্তর করিল "না"। মনোহর চক্রবর্ত্তী তচ্ছ্রবণে বলিলেন "আপনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। আপনার সর্ব্বাঙ্গ এখনও থরথর

করিয়া কাঁপিতেছে। আসুন, আমার বাটীতে কিয়ৎক্ষণ অবস্থানান্তর সুস্থতা লাভ করিবেন।" এই বলিয়া লোকটীকে দ্বিরুক্তি করিতে না দিয়া মনোহর চক্রবর্ত্তী সাদরে তাহার বাহু আকর্ষণপূর্ব্বক গাড়ীতে আরোহণ করাইলেন। তিনি সেই লোকটীকে লইয়া সোণাগাছীতে এক অবিদ্যালয়ে উঠিলেন।

সে গণিকালয়ের সাজসজ্জা অপূর্ব্ব। মনোহর চক্রবর্ত্তী সেই লোকটীকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাঁহাকে সাদরে একটী মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সুরম্য প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। ভামিনী মধুরভাষিণী, তম্বঙ্গী। যে গৃহে তাঁহারা উপবেশন করিলেন, তাহার শোভা অতুলনীয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "গোলাপ! এই ভদ্রলোকটীর আজি মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি আমার গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। তুমি ইহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়া সুস্থ কর। সাবধান, যেন যত্নের কোনরূপ ত্রুটী না হয়। আমি কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় আসিতেছি।"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্রুত পাদবিক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিধি-লিপি।

এক্ষণে গোলাপমোহিনীর একটু পরিচয় দিব। সে ষোড়শী। তাহার রূপলাবণ্য সর্ব্বাঙ্গে যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই কমনীয় কান্তি, সেই অপূর্ব্ব মুখশ্রী, সেই কোকিলকণ্ঠ, সেই ভাবময় অঙ্গসঞ্চালন, ক্ষুদ্রমতি হীনবুদ্ধি আমি কি করিয়া বর্ণনা করিব? কবি হইলে বলিতাম,

"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

আমি কবি নহি—কল্পনারথে আরোহণ করিয়া "অমিয় নিছনী" রূপের বর্ণনা করিতে জানি না, কাজেই আমাকে ঐরূপ নিসর্গসুন্দরীর রূপ বর্ণনকালে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে হয়। সে রূপমাধুরীর বর্ণনা করিবার জন্য প্রাণের ভিতর কত কথাই উঠিতে থাকে, কত ভাবলহরী খেলিতে থাকে, কিন্তু তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারি না। শব্দ-সাগর বুঝি অতলস্পর্শ—তাই সে ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

যাহা হউক, চক্রবর্ত্তী মহাশয় চলিয়া গেলে এহেন স্থিরবিজলী-সদৃশা কামিনী ধীরে ধীরে ভদ্রলোকটীর সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইল। দাঁড়াইয়াই স্থিরদৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। রমণীর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। সে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। যেন কোন স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছে।

পাঠক! এই নবাগতকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনি আমাদিগের সেই পরিচিত হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র সলজ্জভাবে একবার সেই ললনার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহারই প্রতি নির্ণিমেষ লোচনে সেই নারী চাহিয়া রহিয়াছেন। হেমচন্দ্রেরও মাথা ঘুরিয়া গেল। ক্ষণেকের নিমিত্ত তাঁহারও আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিল। তিনি স্বর্গে আছেন, কি মর্ত্তে আছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে তিনিও অবাক হইয়া একদৃষ্টিতে সেই স্ত্রীলোকটীর রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা উভয়ের কেহই জানিতে পারিল না। এমন সময়ে অকস্মাৎ মনোহর চক্রবর্ত্তীর পুনরাবির্ভাব হইল। তখন যুবকযুবতীর যেন চৈতন্যলাভ হইল। গোলাপ শশব্যস্তে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিল।

মনোহর চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়াই হেমচন্দ্র বলিলেন, "আপনার অপার দয়ায়, অপারসীম সৌজন্যে আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি। আমাকে আদৌ আঘাত লাগে নাই। তবে আশঙ্কায় আমি জড়ীভূত হইয়াছিলাম। আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ করিতেছি। ইহজীবনে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। এক্ষণে অনুমতি করিলে আমি প্রস্থান করি।"

মনো। সে কি? আমি কর্ত্তব্য কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই ত করি নাই। আমারই কোচম্যানের দোষে আপনি বিপন্ন হইয়াছিলেন। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

হেম। আপনি ঐভাবে আমাকে সম্বোধন করিবেন না। আমি দীন দুঃখী। বিশেষতঃ আপনার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। আপনি আমার নমস্য। আপনার ন্যায় ভদ্র মহোদয় সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ।

মনো। না—না—কিছুই নহে। কি জানেন, আপনাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়ের স্নেহ-প্রস্রবণ যেন কে খুলিয়া দিয়াছে। আপনার সুন্দর রূপ দেখিলেই আপনাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। যদি আমার অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় এ বাটীতে পদার্পণ করিয়া আমাকে সুখী করিবেন।

হেম। আমরা দীন দরিদ্র ব্যক্তি। চাকুরী ব্যতীত আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর আর স্থানান্তরে যাইবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি থাকে না। তবে, আপনি যখন অনুমতি করিতেছেন, তখন আমি অবশ্যই আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় আসিব।

এই সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোপলাকে ডাকিলেন। গোলাপ সহাস্যে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই বলিল "কি হুকুম?"

মনো। আমরা হুকুম করি, না তোমাদিগের হুকুম আমরাই তামিল করি?

গো। আমরা ত আপনাদের দাসী। চরণপ্রান্তে স্থান দিয়াছেন বলিয়াই আমরা ধন্যা।

মনো। তা বটে। তা বটে! সেইজন্যই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিলেন? যাউক সে কথা। দেখ, এই বাবুটী আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে আসিবেন। দেখ, যেন ইঁহার সম্বর্দ্ধনার কোনরূপ ত্রুটী না হয়।

গো। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যাহা সম্ভব, তাহা করিব। গোলাপের কথা শেষ হইতে না হইতেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে গোপনে কি বলিলেন। এইবার গোলাপ হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন?"

হেমচন্দ্র সেই অমৃতনিষ্যন্দী বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনাদিগের যত্নে মরা মানুষ বাঁচে, আমি আর সুস্থ হইব না।"

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন "Bravo! well said! কেমন আর রসিকতা করিবে?"

গো। তাও কি সম্ভব? আপনারা মহাপণ্ডিত, আমরা নগণ্যা সমাজ-পরিত্যক্তা বেশ্যা। রসিকতার কি জানি?

সে রাত্রিতে হেমচন্দ্র সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।
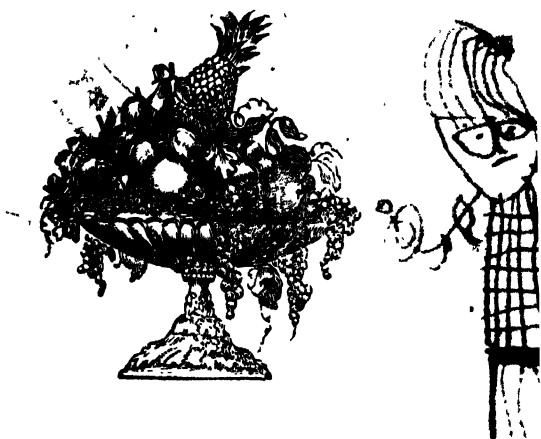
একাদশ পরিচ্ছেদ।

হেমচন্দ্রের কি হইল।

হেমচন্দ্র যখন পুনরায় রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। মধুমাস, মধুর পূর্ণিমা রজনী, মধুর মলয় পবন-হিল্লোল হেমচন্দ্রের প্রাণে যেন কি একটা শূন্যতার সৃষ্টি করিল। হেমচন্দ্র কি জানি কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের হেমলতার কথা মনে রহিল না, মান অপমান, দীনতা দরিদ্রতা, কিছুই মনে রহিল না। লজ্জা, ভয় সকলই যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি গোলাপের বাটী হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া আবার তাহার বাটীতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। গোলাপ ব্যতীত অন্য চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। এক কথায় বলিতে হইলে হেমচন্দ্র 'গোলাপময় হইলেন বলিতে হয়।

নবানুরাগ এমনই হইয়া থাকে। প্রেম পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, দেশ কাল দেখে না। মানুষ যখন প্রণয়োন্মত্ত হয়, তখন সে তদ্গতচিত্ত হইয়া থাকে। তন্ময়তা হয় বলিয়াই পরম প্রেমিক বিল্বমঙ্গলকে চিন্তামণি তাহার সমস্ত ভালবাসা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। যে হেমচন্দ্রের চরিত্র নির্ম্মল স্ফটিকমণিবৎ ছিল, তাহাতে কলঙ্করেখা স্পর্শ করিল।

গোলাপকে প্রথম দর্শনাবধিই হেমচন্দ্রের হৃদয়ে নবানুরাগের সঞ্চার হইল। হেমচন্দ্র জগৎ গোলাপময় দেখিতে লাগিলেন। যে হেমলতা

তাঁহাকে ব্যতীত জানে না, যে হেমলতার তিনিই সংসারে একমাত্র অবলম্বন, যে হেমলতা তাঁহার জন্য শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় পিতৃষ্বসার বাক্যবাণ-যন্ত্রণা অম্লানবদনে অকাতরে সহ্য করিতেছে সেই হেমলতার কথা—সেই হেমলতার রূপগুণ, সেই হেমলতার স্মৃতিটুকুও হেমচন্দ্রের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইল। হায় হেমচন্দ্র! তুমি সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল, হীরক ত্যাগ করিয়া কাচখণ্ড, কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র গ্রহণে সমুদ্যত হইয়াছ। জানিতেছ না, দেখিতেছ না, তোমার সংসারের সকল সুখ, জীবনের সকল সাধ অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে। তুমি উন্নতি-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অবনতির রসাতলে প্রবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছ না। তোমার উচ্চকাঙ্ক্ষা, চরিত্র-মহত্ব, উন্নতি-প্রয়াস, সুযশ সমস্তই অতল কলঙ্কসাগরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছ। ইহাই প্রণয়ের বিচিত্র লীলা! তোমার দোষ নাই, পরমযোগী মহাদেবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, নতুবা মদনভস্ম হইত কি?

হেমচন্দ্র ধীরে ধীরে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া হেমলতা অত্যন্ত উতলা হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র বাটীতে আসিবামাত্রই বালিকা শশব্যস্তে তাঁহার পদপ্রক্ষালনার্থ জল আনিয়া দিল। হেমচন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করণান্তর অপ্রফুল্লমুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেমলতা তাঁহার বদন মলিন ও চিন্তাভারাক্রান্ত দেখিয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। হেমলতার চক্ষে অন্যের অলক্ষ্যে দুইবিন্দু জল আসিল, সে স্বামীর মুখ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইল।

হেমচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর হেমলতা ধীরে ধীরে তাহার অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হেমচন্দ্র তাঁহার

গাড়ী-চাপার কথা বলিলেন, কিন্তু গোলাপের কথা আদৌ প্রকাশ করিলেন না। হেমচন্দ্র রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া হেমলতা মধুসূদনকে প্রাণভরে ডাকিল।

হেম। সেই গাড়ী-চাপার পর হইতেই শরীরটা কেমন খারাপ হইয়াছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আজ আহার করিবার প্রবৃত্তিও নাই।

হেমলতা। কিছু আহার না করিলে শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তুমি পরমান্ন ভালবাস বলিয়া আজ পরমান্ন প্রস্তুত করিয়াছি।

হেম। বেশ করিয়াছ হেমলতা। কিন্তু পরমান্নে আমার আর রুচি নাই। তবে তোমার অনুরোধে একটু মাত্র খাইতে পারি।

হেমলতা বড় আশা করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল হেমচন্দ্রকে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিবে। কিন্তু বিধাতা তাহার সে সাধ পূর্ণ করিলেন না। এ সংসারে এমনই ঘটিয়া থাকে। লোকে বড় সাধ করিয়া যাহা করে, যে সাধ পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না, কোন অজ্ঞাত বা অভাবনীয় কারণে সে সাধ পূর্ণ হয় না। ইহাতেই মনে হয়, কোন কার্য্যেই আমাদিগের কৃতিত্ব নাই। যাহা হইবার, তাহা হইবে। অলক্ষ্যে অজ্ঞাত হস্তে ঘটনা পরম্পরায় কার্য্য সিদ্ধি হইতেছে। যে ঘটনা স্থির হইয়া আছে, অথচ যাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি, তাহা সম্পন্ন হইবেই হইবে। উহার গতিরোধ বা উহাতে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

হেমলতা পরমান্ন আনিতে রন্ধনগৃহে গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পরমান্ন-পাত্র আবরণহীন অবস্থায় পতিত

রহিয়াছে। কে পরমান্ন ভোজন করিল, হেমলতা তাহা স্থির করিতে পারিল না। বড় সাধ করিয়া হেমচন্দ্রকে পরমান্ন খাওয়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইল না। হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিল। একবার ভাবিল, তাহার পিসিমা কি এরূপ করিয়াছেন? পরমুহূর্ত্তেই সে সন্দেহ বিমুক্ত হইল। পিসিমা কি এমন কর্ম্ম করিতে পারেন? সরলা বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, মনুষ্য প্রকৃতি বুঝে না। তাই তাঁহার পিসিমার উপর সন্দেহ করিতে পারিল না!

হেমলতা ক্ষুণ্নমনে হেমচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসিল। হেমচন্দ্র ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, অল্প পরিমাণে পরমান্ন খাইবেন বলায় বোধ হয় বালিকার দুঃখ হইয়াছে। হেমচন্দ্র তাই বলিলেন, আমি সামান্য পরিমাণে পরমান্ন খাইলে যদি তুমি এতই ক্ষুণ্ণ হও, আচ্ছা লইয়া আইস, আমি প্রচুর পরিমাণেই খাইব।"

হেমচন্দ্রের এই কথায় হেমলতার দুঃখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। হেমলতা হেমচন্দ্রকে সকল কথা বলিল। পাত্রে যে ভুক্তাবশিষ্ট পরমান্ন ছিল, তাহাও হেমচন্দ্রকে আনিয়া দেখাইল। হেমচন্দ্র সহজেই বুঝিতে পারিলেন, কাহার রসনা উক্ত পরমান্নদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি হেমলতাকে কিছুই বলিলেন না। হেমলতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না। আমি ত প্রথমেই বলিয়াছি, আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই। সুতরাং পরমান্ন না থাকাতে, ভালই হইয়াছে। তোমার অনুরোধে পরমান্ন খাইতাম বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহাতে অসুখ করিত।"

সে রাত্রিতে হেমলতা জলস্পর্শ করিল না।

—o—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

-*•*-

সূত্রপাত।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। মাতাপিতার বড় আদরের হেমলতা এক্ষণে দিবানিশি পিতৃস্বসার তাড়নায় নিদাঘের উত্তপ্ত বায়ুতাড়িত লতার ন্যায় দিন দিন শুকাইতে লাগিল। হেমলতার সংসারে একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সহায়, একমাত্র সম্পদ, একমাত্র আশাভরসাস্থল—হেমচন্দ্র। যদি হেমচন্দ্রের প্রেমবারি হেমলতা-রূপ বল্লরীমূলে সেচন করা না হইত, তাহা হইলে কঠোরভাষিণী, প্রখরা দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ক্রোধানলে হেমলতা কোন্‌কালে ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

পূর্ব্বদিবসে শকট-সঙ্কটে হেমচন্দ্রের অসুস্থতা উপস্থিত হওয়ায় হেমলতা প্রভাতে হেমচন্দ্রের ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্রের জন্য হেমলতাকে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া দিগম্বরী ঠাকুরাণী জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "ওলো হিমি! অত ভাল নয়। যা রয় সয়, তাই কর।"

হেমলতা। পিসি মা, আমি কি অপরাধ করেছি?

দি। অপরাধ আর কি? আজকাল মেয়েগুলো পেট থেকে পড়েই স্বামীর জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে। ছি! যেমন বয়স, তেমনই থাক্‌তে হয়। আমাদের কি আর ঐ বয়স ছিল না?

হেমলতা। পিসি মা! আমাকে বৃথা গঞ্জনা দিচ্ছেন। কি কর্‌বো, বিধাতা বাদ সেধেছেন। যদি আমার স্কন্ধে সংসারের

ভার না পড়তো, যদি পিতামাতা বেঁচে থাক্‌তেন, তা হলে আমাকে কি এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হ'ত?

দি। কি হারামজাদি! আমার মুখের উপর জবাব! আমি কি তোদের কিছু দেখি না যে তুই কথায় কথায় বাপ মার খোঁটা দিস্? নেমকহারাম! তোর ইহকাল পরকাল নেই।

হেমলতা। আমার অপরাধ হয়েছে, পিসিমা আমাকে ক্ষমা কর। সত্যই তুমি না থাক্‌লে আমাদের দুর্গতির শেষ থাক্‌ত না।

দি। ওলো হিমি—হলি কি? "আমি না থাক্‌লে" কথার মানে কি? তবে কি তুই আমার মরণ টাকচিস্? এমন নইলে কলিকাল হ'বে কেন? আমি মরি, আর তুমি হাত পা ছড়িয়ে খাও। মিন্‌সে আসুক, আজই তোদের বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দিতে ব'লব। "যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!" বটে! রস্ তোর বিষ্‌নি বার করছি।

হে। পিসিমা—হাতযোড় ক'রে বলছি, অমন কথা মুখে এনো না। পিসে মশায় আর তুমি ছাড়া আমাদের কে আছে? আমাদের কোথায় তাড়িয়ে দেবে। আমি যে তোমাদের মেয়ে!

দি। হাতযোড়ের কথা মুখে আনিস্ নি, ওতে তোর জাত যাবে। আমার কাছে হাতজোড় করলে তোর মহাপাপ হ'বে রে। তোর স্বামী এখন রোজগার কর্‌তে শিখেছে, তোরা দুপয়সার মুখ দেখ্‌তে পাচ্চিস্, এখন আর আমরা কে? আমাদের তোয়াক্কা রাখ্‌বি কেন?

হে। পিসিমা—যদি দুপয়সা রোজগার হয়, সে তোমাদেরই আশীর্ব্বাদে ও দয়ায় হয়। মাইনের টাকা সমস্তই ত তোমাকে দেওয়া হয়।

দি। সাবধান, হিমি! 'মাইনের খোঁট দিস্‌নি। আমরা তোদের অমন টাকা গ্রাহ্য করি না। ক'টাকা দিস্ লো? একবার ভেবে দেখ, তোদের জন্য কত খরচ পড়ে। হেমা ছোঁড়াটা ত রাক্ষসের মত খায়। যে ক'টা টাকা দিস্, তাতে কি তোদের খাওয়ার খরচ কুলোয়? আমরা আর তোদের টাকা নেবো না, তোরা আলাদা হ'গে যা।

হে। পিসিমা! আমি অত কি জানি? আমরা কি তোমাদের পর?

দি। ওলো! জানি জানি! তুই যে একেবারে নেকী সাজ্‌লি! তুই আবার আপন পর চিনিস্ নে। হেমা যে উপরি টাকা আনে, তা আমাদের দিস্ না—লুকিয়ে রাখ্‌তে জানিস্—আর আপন্ পর বুঝিস্ না। রেখে দে তোর নেকামী।

হে। দোহাই পিসিমা। আমি এক পয়সাও রাখি না। আমি কি তোমাদের লুকিয়ে টাকা রাখ্‌তে পারি?

দি। আর সতীপনায় কাজ নেই, আমি সব জানি। তোরা এখনই দূর হ।

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া হেমলতার প্রাণ উড়িয়া গেল। হেমলতা সরলভাবে যাহা বলিল, তাহার যে কদর্থ ঐরূপ হইতে পারে, হেমলতা স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই। কাজেই পিতৃষ্বসার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমচন্দ্র ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। হেমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে হেমচন্দ্র বলিলেন, "এরূপে আর কয় দিন কাটিবে? হয় তুমি পিসিমাকে লইয়া থাক, নতুবা আমার সহিত অন্য স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি ইঁহাদের সহিত একত্র কিছুতেই

থাকিব না।” হেমলতা উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। দিগম্বরী ঠাকুরাণী যতই কেন অত্যাচার করুন না, কটুকাটব্য বলুন না, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় হেমলতাকে কন্যাবৎ পালন করিতেছিলেন। সুদ্ধ ইহাই নহে, হেমলতা পিসিমাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে স্বতন্ত্র ভাবে অন্য বাটীতে একাকিনী থাকিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইল। পিসিমাকে ত্যাগ করিতে হইলে তাহার যেন হৃদয়ের একটী তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কাজেই সে হেমচন্দ্রকে সকাতরে বলিল, “পিসিমার ঐরূপ কোপনস্বভাব। উঁহার কথায় রাগ করিয়া যদি আমরা স্বতন্ত্র হই, লোকে আমাদিগেরই নিন্দা করিবে। বিশেষতঃ যিনি আশৈশব লালনপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিব? পিসিমাকে না দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে। পিসিমার কথায় আমি রাগ বা দুঃখ করি না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার মুখ চাহিয়া পিসিমার কথা ভুলিয়া যাও।”

হেমলতা যে ভাবে এই কয়েকটী কথা বলিল, তাহাতে হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। হেমচন্দ্রের মানসিক অবস্থা যদি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি হেমলতার সকরুণ প্রার্থনায় বিচলিত হইতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। গত রাত্রি হইতে তাঁহার যেন ভাবান্তর ঘটিয়াছে।

তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, “তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর। পরে আমাকে কোন বিষয়ের জন্য দোষ দিও না।”

হেমচন্দ্রের এরূপ উত্তরে হেমলতা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিল না। এরূপ কথা হেমচন্দ্র কখন ত তাহাকে বলে নাই। যাহা হউক, সে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া হেমচন্দ্রের আহারাদির উদ্যোগে ব্যাপৃতা হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

"দেওয়ানজী! চেষ্টায় কি না হয়?"

দেওয়ান উত্তর করিল "কেবল চেষ্টাতেই ফলোদয় হয় না। বুদ্ধিমত্তাও ইহার সহিত প্রয়োজন।"

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই হইয়াছে। দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রকে কলিকাতায় পাইব, আমার অন্তরাত্মা আমাকে পূর্ব্বাপর বলিতেছিল। পাইয়াছিও তাই। কি অভাবনীয় ঘটনা!"

দে। বস্তুতঃ, অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। আচ্ছা! হুজুর কি হেমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিলেন?"

ম। "পারিব না। আমার যে উহার উপরই লক্ষ্য। আমি উহার ছায়া দেখিলে চিনিতে পারি।

দে। হেম কি আপনাকে চিনিয়াছে?

ম। বোধ হয় না। দেখ, দেওয়ানজী, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। আমি সংবাদ পাইয়াছি, হেমের বিবাহ হইয়াছে।

দে। তাহাতে আর আমাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

ম। তুমি বাতুল! হেমের বিবাহের কথা কেন বলিলাম, তাহা তুমি বুঝিলে না!

দে। আজ্ঞে না। আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। হেমের জন্য আপনি এখনও এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন কেন?

ম। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!! প্রতিশোধ!!! পুত্র মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। হেমচন্দ্রও তাহার মাতা-পিতার কৃতকার্য্যের জন্য ফলভোগী হইবে। আমি তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিব।

দে। কিরূপে?

ম। সে পরে বলিব? তুমি এখন এক কাজ কর। অদ্য সন্ধ্যার সময় গোলাপের বাটীতে হেমের আসিবার কথা আছে। তথায় তাহার জন্য নানাবিধ চব্যচূষ্যলেহ্যপেয় খাদ্যের আয়োজন করিও। দেখিও, যেন কোন বিষয়ের ত্রুটী না ঘটে।

দেওয়ানজী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। মনোহর চক্রবর্ত্তী তখন একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া রৌপ্যাধার-পরিশোভিত মনোহর আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন, "আমার নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী। আমার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জলপান করে। আমি একটা দুগ্ধপোষ্য বালককে দমন করিতে পারিব না। দীনদয়াল চক্রবর্ত্তী ও তাহার বিধবা ভার্য্যার অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন, তাই আমার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া ইহধামে অধিক দিবস থাকিল না। কিন্তু হেমচন্দ্রের নিস্তার নাই। আমার কৌশলজালে পতিত হইয়া তাহার লাঞ্ছনার একশেষ হইবে; আমি বিধিমতে তাহার সর্ব্বনাশ করিব। তাহাকে পথের ভিখারী করিব, সমাজের আবর্জ্জনাস্বরূপ করিয়া—তাহার গৃহসুখ নষ্ট করিয়া—তাহার ভার্য্যাকে স্বৈরিণী করিব, তবে আমার নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী। যতদিন না করিতে পারিতেছি, ততদিন আমার প্রতিহিংসনাল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবংবিধ বিষম চিন্তায় যখন নিমগ্ন, সেই সময়ে এক বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বৈষ্ণবীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বৎসর। নাকে রসকলি, গাত্রে হরিনামের ছাপ, কণ্ঠে তুলসীর মালা। বৈষ্ণবী মধ্যমাকৃতি, বর্ণ শ্যামল, অবয়ব মন্দ নহে। তাহার স্কন্ধের ঝুলিতে কিছু চাউল আছে। বৈষ্ণবী সহাস্যবদনে গাহিল,

সখি! কালবরণ।
অমিয় নিছনি, সে রূপের খনি, নাহি ভুলে মম মন॥
শয়নে স্বপনে
কিংবা জাগরণে,
দিবানিশি রূপরাশি হৃদে রহে জাগরণ।
সে বিনা আমার, কিছু নাহি আর, তাঁহারে সতত হয় যে স্মরণ॥
সেই ধ্যান জ্ঞান
সে মম পরাণ,
জীবন যৌবন, করেছি অর্পণ স্মরি তাঁর শ্রীচরণ।
পাতি পাতি করে, খুঁজেছি সংসারে, তবু না দেখি তাহারই তুলন॥

গীত সমাপনান্তে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী জমিদারকে প্রণাম করিল। মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "অতি মধুর। তোমার কণ্ঠধ্বনি বুঝিবা নারদের বীণাধ্বনি অপেক্ষাও সুললিত। আমি তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম।

বৈ। আমার সৌভাগ্য! আপনার ন্যায় জমীদার একটা সামান্য বৈষ্ণবীর বিষয় স্বপ্নেও মনোমধ্যে স্থান দেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

ম। বিদ্রূপ থাক। এখন কাজের কথা বল।

বৈ। আমি অকাজের কথা কখনই বলি না। তবে আপনার নিকট কোন্‌টা কাজের হইবে, আর কোন্‌টা অকাজের হইবে, তাহা বলিতে পারি না।

ম। সমস্ত মঙ্গল?

বৈ। আপনার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ।

ম। তথায় গিয়াছিলে?

বৈ। কোথায়? যমালয়ে?

ম। তুমি কি রহস্য ত্যাগ করিবে না?

বৈ। কোন্ কথাটা রহস্য প্রভো?

ম। আমি যমালয়ের কথা বলিতেছি না। সেখানে এত সত্বর যাইলে চলিবে কেন?

বৈ। আমিও তাই সঙ্গীর অপেক্ষায় আছি।

ম। বটে! ভাল! সঙ্গী না হয় পরে জুটিবে। এখন বল, হেমচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলে?

বৈ। সেই ত যমালয়। আবার যমালয় কোথায় আছে?

ম। কিরূপ?

বৈ। বাপ্! যে দিগম্বরী ঠাকুরাণী আছেন। একাই একশত।

ম। সে কে?

বৈ। পরে জানিতে পারিবেন। সেইজন্যই ত বলিতেছিলাম, সঙ্গীর অপেক্ষায় আছি।

ম। সে কিরূপ?

বৈ। অপরূপ সেরূপ,
হইলে বিরূপ,
নাহি থাকে রূপ,
কহিনু স্বরূপ।
শতমুখীর রূপ,
ভীষণ কুরূপ,
পৃষ্ঠে নানারূপ
করে দেয় রূপ।

ম। বাঃ বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী। এ যে দেখিতেছি কণ্ঠে সরস্বতী আবির্ভূতা।

বৈ। কণ্ঠে নহে স্কন্ধে—সরস্বতী নহে প্রেতিনী।

ম। দেখ ভবদাসী! আমি প্রকৃত কথা শুনিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি ভূমিকা ত্যাগ করিয়া আসল কথার অবতারণা কর।

বৈ। কথাটা আর কি! আমার দ্বারা সে কার্য্য হইবে না। আপনি আমাকে বিদায় দিউন!

ম। সে কি! তুমি এক প্রেমারার তাড়ায় ভয় পাইয়াছ? ব্যাপারটা খুলিয়াই বল না?

বৈ। আমি সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম। হেমচন্দ্রের স্ত্রী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। একাধারে এত রূপ গুণ বুঝি মানুষের হয় না।

ম। বটে! বটে! তাহার পর? তাহার পর?

বৈ। তাহার পর আর কি? এক চামুণ্ডা মূর্ত্তি এসেই আমাকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিল। আমি উভরড়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি।

ম। আবার হেঁয়ালী? সে কে?

বৈ। শ্রীলা শ্রীযুক্তা দিগম্বরী ঠাকুরাণী ওরফে হেমচন্দ্রের ভার্য্যা হেমলতার পিসিমা।

ম। সে বুঝি বড়ই ভয়ঙ্করী?

বৈ। ভয়ঙ্করী? একবার পাল্লায় পড়িলে টের পাইবেন।

ম। তবে কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই?

বৈ। রসুন ঠাকুর। আপনি যে দেখিতেছি, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি চাহেন?

ম। বল, বল, তবে বুঝি আশা আছে? আমি তোমার কথায় নৈরাশ্য-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, আর একটু হইলেই ডুবিয়া মরিতাম।

বৈ। মরণ বল্লেই কি হয়? এখন ভোগের অনেক বাকী আছে।

ম। কবে ভোগ হইবে বল?

বৈ। দেখুন, হরির ইচ্ছা।

ম। আবার তোমাকে যাইতে হইবে। কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবে। এই লও, অগ্র দশ টাকা।

বৈষ্ণবী আবার মধুর কণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

—০—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—○*○—

বৈষ্ণবীর পরিচয়।

এখন বৈষ্ণবীর কিছু পরিচয় দিব। ভবদাসী বৈষ্ণবীকে চিনেন না বা জানেন না, কলিকাতায় এরূপ ধনিপুত্রের সংখ্যা অতি অল্প। ভবদাসীর সহিত আলুর তুলনা করা যায়। ঝালে, ঝোলে, অম্বলে আলু যেমন সকল ব্যঞ্জনেই চলে, তেমনি আমাদিগের বৈষ্ণবীও সকল বিষয়েই পরিপক্ক। এমন কার্য্য নাই ভবদাসী বৈষ্ণবী যাহা করিতে না পারে। ভবদাসী দিনে হরি, রাত্রিতে যিশুখৃষ্ট ভজিয়া থাকে।

মনোহর চক্রবর্ত্তীর কলিকাতায় পদার্পণের দিনেই এহেন ভবদাসী বৈষ্ণবীর মাথায় টনক নড়িয়াছিল। তাহার পর, গোলাপের বাটীতে বৈষ্ণবীর সহিত চক্রবর্ত্তী-পুঙ্গবের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবীর সাহায্য গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়েন। বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনোভাব অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কার্য্যভার গ্রহণ করে। ভবদাসী বুঝিল, এরূপ শীকার সহজে জুটে না। তাহার ভাগ্য নিতান্ত সুপ্রসন্ন, তাই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৃষ্টিপথে সে পতিত হইয়াছে। যাহা হউক, পবন পাবকের সহায় হইল। এই মণি-কাঞ্চন সংযোগে পৃথিবী রসাতলে যাইতে পারে—হেমচন্দ্রের সর্ব্বনাশ সাধন ত সামান্য কথা?

পাপিষ্ঠ মনোহর চক্রবর্ত্তী এক লোষ্ট্রে দুই পক্ষী বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। একদিকে গোলাপের কুহকে হেমচন্দ্রকে কুপথগামী করা, অন্যদিকে ভবদাসী বৈষ্ণবীর প্রলোভনে আনায়বদ্ধ

হরিণীর ন্যায় হেমলতাকে স্বীয় করায়ত্ত করা। মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোষাগার ধনপূর্ণ, লোকবল অপরিমিত, কূটবুদ্ধি প্রখরা, কাজেই অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহই রহিল না। ইহার উপর আবার গোলাপের ন্যায় রূপ-যৌবন-শালিনী অবিদ্যা, ভবদাসার ন্যায় দূতী রহিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে করিতে লাগিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি ইন্দ্রের শচীকেও সহজে করতলগত করিতে পারেন।

মানুষ নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, স্থূলদর্শী। মানবের বুদ্ধি কিয়দংশে কূপমণ্ডুকের সমতুল্য। ভেক যেরূপ মনে করে কূপই সমগ্র জগৎ এবং সে সেই জগতের একমাত্র অধিপতি, মানুষও তদ্রূপ মনে করে— তাহার স্বল্প বলের নিকট, তাহার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধির নিকট, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরাভূত। মানুষ পৃথিবীর যতটুকু চক্ষে দেখিয়াছে, কার্য্য করিবার সময়, ততটুকুর কথাও ভাবে না। তাহার আয়ত্বে বা অধিকারে যাহা আছে, তাহাই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকে। বুঝে না, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে কীটাণুকীট অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ও লঘু। বুঝে না, যাঁহার প্রভাবে অনন্ত কোটী পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না—মানবের ক্ষমতা প্রত্যেক বিষয়েই প্রতিহত হইয়া থাকে। ইহা বুঝে না বলিয়াই, অসীম শক্তির প্রতিকূলে মানবকে সসীম শক্তি প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, শয়তানের ন্যায় মানব সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে। হায়! ক্ষুদ্রজীব! তুমি জান না, কোন বিষয়েই তোমার কৃতিত্ব নাই। সেই সর্ব্বকর্ম্মানিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর যাহা স্থির করিয়াছেন, যাহা ঘটনাশৃঙ্খলে সংবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম কদাপি সংসাধিত হইতে পারে না।

মনোহর চক্রবর্ত্তীর অনুষ্ঠানের ক্রটী হইল না। বৈষ্ণবী সর্ব্বপ্রথমে সেই দিবস হেমচন্দ্রের বাটীতে গিয়াছিল। হেমচন্দ্রের বাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সে মনোহর চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়ে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

ভবদাসী বৈষ্ণবী বাল-বিধবা। ভবদাসী কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে। কুটীরের চতুর্দ্দিক মালঞ্চবেষ্টিত; কুটীরখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার সংসারে আর কেহ নাই, গ্রাম সম্পর্কে এক মাতুল অভিভাবক স্বরূপ মাঝে মাঝে আসিয়া তথায় বাস করে। এ ব্যক্তিই তাহার সর্ব্বস্ব।

ভবদাসী সদাই দেশী সাদা ধুতি পরিধান করিত। সেই শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, চোখ মুখ ঘুরাইয়া, ঈষৎ মৃদু হাস্য সহকারে বৈষ্ণবী যখন কথা কহিত, তখন আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, দেবাদিদেবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত। ভবদাসীর মাতুল সম্বন্ধে নানা কুজনে নানা কুকথা রটনা করিত, কিন্তু আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, ভবদাসী কস্মিনকালেও ইহার সত্যতা কাহারও নিকট স্বীকার করে নাই। সংসারে দুষ্ট লোকে নানারূপ মন্দ কথার অবতারণা করিয়া থাকে। ভবদাসীর ভাগ্যেও তদ্রূপ মন্দ লোকের অসদ্ভাব হয় নাই। ইহারা এমনও বলিত যে, ভবদাসী দিবসে মালা ধারণ, তিলক সেবা করিলেও রজনীতে শাক্তমতে "মকারের" শ্রাদ্ধ করিত। এ সম্বন্ধে কেবল আনুমানিক প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে তাহার শত্রুপক্ষ ইতস্ততঃ করিত না।

সহস্র দোষে থাকিলেও, ভবদাসীর একটী মহৎ গুণ ছিল। সে অতি মধুর কীর্ত্তন গাহিতে পারিত। টপ্পাতেও তাহার ব্যুৎপত্তি

কম ছিল না। সুরে তালে ভবদাসীর জোড়া খুঁজিয়া পাওয়া ভার ছিল। ভবদাসী যখন রাগিনী আলাপ করিত, তখন পশুপক্ষীও স্তব্ধ হইয়া থাকিত, শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রপুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিত।

অর্থের লোভে বা রিপুর তাড়ণায় সে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও সে যে একেবারে দয়ামায়াবর্জ্জিতা ছিল, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। এহেন বৈষ্ণবীকে পাইয়া ভূম্যধিকারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক কার্য্য করিবেন স্থির করিলেন। ফল যাহা হইল, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

অবস্থান্তর।

গোলাপের বাটীতে এক্ষণে হেমচন্দ্র প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্র শনৈঃশনৈঃ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টা এখানে বিফল হইল না। মনোহর চক্রবর্ত্তী এবং গোলাপের বিশেষ অনুরোধে হেমচন্দ্র প্রথমে অল্প পরিমাণে সুরা সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে সরাপের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে হেমচন্দ্র পূরা মাতাল হইয়া দাঁড়াইলেন।

হেমচন্দ্র যে রাত্রিতে প্রথম সুরা পান করেন, সে রাত্রিতে বাটীতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন এক প্রকার আশঙ্কা ও সঙ্কোচের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই আশঙ্কা ও লজ্জার প্রাবল্যে তাঁহার সুরা-সেবনজনিত মত্ততাও কথঞ্চিৎ ঘুচিয়া গিয়াছিল। হেমচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, দুঃখিনী হেমলতা, গোলাপ ও সুরাপানের সংবাদে কি মর্ম্মান্তিক কষ্টই না পাইবে? কেবল ইহাই নহে— দিগম্বরী ঠাকুরাণীর গঞ্জনার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। হেমচন্দ্র যে বিষম অপরাধ করিয়াছে, সে রাত্রিতে তাঁহার তাহা মনে হইয়াছিল।

যে রাত্রিতে হেমলতা প্রথমে হেমচন্দ্রের অধঃপতনের কথা জানিতে পারে, সেই রাত্রিতে সে আদৌ নিদ্রামগ্ন হইতে পারে নাই— সমস্ত রাত্রিই কাঁদিয়া যাপন করিয়াছিল। হেমচন্দ্র কিসে সুস্থ

হইবেন, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র যাহাতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন; তজ্জন্য হেমলতা সমস্ত রাত্রি কখন বা তাঁহার পদসেবা; কখন বা ব্যজন সঞ্চালন করিয়াছিল। তাহার মর্ম্মব্যথার কথা কে বুঝিবে? হেমলতার চক্ষুঃনিসৃত দুই একবিন্দু তপ্ত অশ্রু হেমচন্দ্রের পাদমূলে পতিত হইয়াছিল কি না, আমরা বলিতে পারি না। পতিত হইলে বোধ হয় সতীর নয়নাসারে—মর্ম্মান্তিক কষ্টজনিত অশ্রুবিন্দুতে—হেমচন্দ্রের মলিনতা বিধৌত হইয়া যাইত। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে স্বর্ণ পতিত হইলে তাহার যেরূপ মলিনতা দূরীভূত হয়, সেরূপ পতিব্রতা সাধ্বী সতীর তপ্ত অশ্রুকণায় হেমচন্দ্রের চরিত্র-দোষ যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

হেমলতা সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিল, হেমচন্দ্রের যেন কোনরূপ অনিষ্ট না ঘটে। সে হেমচন্দ্রের কোন দোষই দেখিতে পায় নাই। সে জানিত, হেমচন্দ্র দেবতা। দেবতার দোষ কি কখন সম্ভবে? যাহা কিছু বিপদ ঘটিতেছে, তাহা তাহার নিজের কর্ম্মফলনিবন্ধন ঘটিতেছে, ইহাই তাহার ধারণা।

মানুষ যখন প্রথমে কোন কুকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে কলুষিত হয় না,—সরলতা ও পবিত্রতা তখনও তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কাজেই পাপকার্য্য করিবার সময় বিবেকের দংশন সে অনুভব করে। সারল্যপ্রযুক্ত সে স্বীয় অপরাধের কথা আত্মীয় বন্ধুর নিকট অকপটচিত্তে ব্যক্ত করিয়া থাকে। পরে যতই সে কুকর্ম্মে রত হয়, ততই তাহার হৃদয় কঠিন হইতে থাকে, লোকনিন্দা,

ধর্ম্মভয় প্রভৃতি সদ্বৃত্তিনিচয় তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহা স্বাভাবিক অখণ্ডনীয় নিয়ম। হেমচন্দ্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল, তাই তিনি প্রথম প্রথম সকল কথাই হেমলতার নিকট প্রকাশ করিতেন। গোলাপ যে অতুলনীয়া রূপসী, তাহা বলিতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। গোলাপের প্রতি তাঁহার যে চিত্তাকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছিলেন। হেমলতা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হয়ত মনে মনে বলিয়াছিল, 'গোলাপ নিশ্চয়ই ভাগ্যবতী, নতুবা তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি গোলাপের পক্ষপাতী হইবেন কেন?'
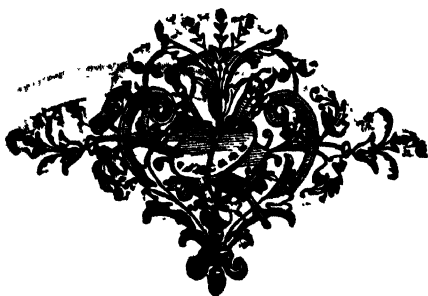
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশের সূচনা

গোলাপ ও হেমচন্দ্র শরতের পূর্ণিমা রাত্রিতে অলিন্দে বসিয়া মনের আবেগে পরস্পরে নানারূপ সোহাগের কথা কহিতেছে। নিকটে বোতলবাহিনী লোহিতবরণী সুরাদেবী বিরাজিতা। সুরাপূর্ণ প্রোজ্জ্বল স্বচ্ছ কাচনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পানাধার সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। নানারূপ আহার্য্যের সুগন্ধে স্থানটী আমোদিত হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের প্রণয়ে বিভোর। প্রেমের মত্ততার সহিত সুরাসেবনের মত্ততা সম্মিলিত হইয়া উভয়কে সপ্তম স্বর্গে আরূঢ় করিয়াছিল। উভয়েই তদ্গতচিত্ত, উভয়েই মনের সুখে, প্রাণ ভরিয়া প্রেমের পিপাসা মিটাইতেছে।

দূরে—অতি দূরে—কেহ মধুর বংশীধ্বনি করিতেছিল। যে বাঁশরীর রবে যমুনা উজান বহিত, ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করিত, গোপিকাদিগের কুলমান রক্ষা করা দায় হইত—বুঝি সেই ত্রিভঙ্গবঙ্কিম শ্যাম যমুনা পুলিনে লতাবিতানে সখাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মধুর বংশীধ্বনি করিতেছেন! সেই দূরাগত বংশীধ্বনি প্রেমিকযুগলের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে পূর্ণ শশধর বিরাজিত। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে কুসুমনিচয়ের সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফুল্ল জ্যোৎস্নস্নাতা রজনীতে উভয়েই পরস্পরের মুখের প্রতি আবেগভরে চাহিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিল।

কতক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গোলাপ বলিল, "আমি ভাবিতেছি, তুমি কত সুন্দর! ঐ মেঘশূন্য সুনীল গগনপটের শোভাবর্দ্ধনকারী শশাঙ্ক সুন্দর, কি আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র তোমার এই মুখখানি সুন্দর? মনে হইতেছে চাঁদ কলঙ্কী—তোমার এই মুখচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক—তাই তুমিই সুন্দর।

হেমচন্দ্র বলিলেন, আমি ভাবিতেছি—ত্রিদিবপতির শচী সুখদায়িনী, কি আমার গোলাপ সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী? গোলাপ! তুমি বোধ হয় অপ্সরাকুলের শিরোমণি ছিলে, মর্ত্তে শাপভ্রষ্টা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

গো। ভালবাসার আধিক্যে তুমি যাহা বলিতেছ—তাহা প্রকৃত নহে। আমি গুণহীনা কুৎসিতা বেশ্যা। সমাজের মধ্যে আমাদিগের অপেক্ষা ঘৃণ্য জীব আর কে আছে বল দেখি?

হে। সমাজ কীর্ত্তিনাশায় ডুবিয়া যাউক, সংসার উৎসন্ন যাউক, আমি কিন্তু তোমাকে পাইয়াই সুখী। "তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।" কখন কখন আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে বলিয়া যা দুঃখ। গোলাপ আর একটু মদ দাও। সংসারের কথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত করি।

গো। আবার সংসারের কথা মুখে আনিতেছ? আমাকে যদি ভালবাসিতে, প্রকৃতই যদি তোমার পদসেবার উপযুক্ত দাসী ভাবিতে, তাহা হইলে কি তুমি সংসারের কথা মনে আনিতে পারিতে? আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নতুবা তোমার চরণপ্রান্তে স্থান পাইলাম না কেন?

হে। অমন কথা মুখে আনিও না। আমি তোমাতে মজিয়া গিয়াছি। আমি আমার স্ত্রীকে ভুলিয়াছি, কর্ত্তব্য ভুলিয়াছি, আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। গোলাপ! তোমাকে তিলেকের তরে

না দেখিলে সংসার শূন্যময় দেখি, মনে হয়, জগৎ সংসারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝি বিলুপ্ত হইল। আমি তোমার জন্য সকলই ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি তুমি বল, আমি তোমাকে ভালবাসি না!

গোলাপ সত্বর হেমচন্দ্রের হস্তে মদিরাপূর্ণ পাত্র প্রদান করিল। হেমচন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিয়া মত্ততার মাত্রা আর একটু বৃদ্ধি করিলেন। হেমচন্দ্র গাহিলেন,—

রাধা নাম কর সার।
রাধা অগতির গতি,
পরমা প্রকৃতি,
রাধা বিনা সকলই অসার।
হৃদি অন্তরালে, রাধা রাধা বলে. ডাকে জীব অনিবার॥
ভকতি মুকতি
ধ্যান জ্ঞান রতি,
শ্রুতি স্মৃতি মতি, সঁপেছে এদাস চরণে তাঁহার।
রাধার বিহনে, এ তিন ভুবনে, বল আর কে আছে আমার॥
আমি রাধাময় হয়ে, রাধারে ধেয়ায়ে, পূর্ণব্রহ্মরূপে হয়েছি প্রচার।
রাধা না থাকিলে, কহিত সকলে, জড় ভূত সুদ্ধ শবাকার॥

হেমচন্দ্র গীত সমাপনান্তে গোলাপের পাদমূলে ঢলিয়া পড়িলেন। গোলাপ ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইল।

গোলাপ গাহিল—

তুমি হে আমার,
আমি যে তোমার,
তোমা বিনা কিছু জানি না জানি না।

তুমি বিশ্বময়, হেরে আঁখিদ্বয়, মিনতি চরণে দাসীরে ছেড়ো না।
আমারই পরাণ, তোমারই চরণ, যেন কভু ছাড়া হয় না, হয় না॥
জীবনে মরণে, থাকি তব ধ্যানে, হৃদয়-মাঝারে নাহি অন্য ভাবনা।
অবোধ পরাণ, লয়েছে শরণ, অভাগীরে নাথ ভুল না, ভুল না॥

মদিরায় হেমচন্দ্রের নয়ন ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। গোলাপে সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বলিলেন, "আমি চিরদিন তোমার দাস। জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে, তোমাকেই হৃদয়াধিষ্ঠা দেবীরূপে পূজা করিব। আমি স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছি তোমারই জ গৃহ ত্যাগ করিয়াছি তোমারই জন্য, চাকুরী ত্যাগ করিয়াছি তোমার জন্য। তুমিও যে আমা ব্যতীত আর কিছু জান না, তাহাও আ জানি। জানি, যথায় ভালবাসার প্রতিদান আছে, তথায় স্বর্গ-সুখাপেক্ষা অধিকতর সুখলাভ করা যায়। আমরা উভয়েই সেই সুখের অধিকারী। এস গোলাপ—উভয়ে আর একটু মদ্য পান করি।"

গোলাপ বলিল, "তুমি যেরূপ আমার জন্য সকলই ত্যাগ করিয়াছ, আমিও তদ্রূপ তোমার জন্য সমস্তই ছাড়িয়াছি। মনোহর বাবু তোমার কথা জানিতে পারিয়া এখানে আর আসেন না। তুমি ব্যতীত আমি আর কোন পুরুষের মুখ দেখি না। আমার যাহা কিছু আছে—যৌবন-সম্পদ, দেহ প্রাণ, সকলই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি। তুমি দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছ—দয়া করিয়া দাসী বলিয়া ভালবাস—ইহাতেই আমি ধন্যা হইয়াছি।"

গোলাপ স্বয়ং সুরাপান করিল। আবার হেমচন্দ্রকে দিল। উভয়ে তখন বিভোর হইল।

তখন গোলাপ গাহিল—

কি আর বলিব আমি।

ধরম করম, পিরীতি সরম সকলই হয়েছ তুমি।

তোমার তরেতে,

না পারি করিতে,

কি আছে জগতে নাহি জানি আমি।

ও রূপ সাগরে, চিরদিন তরে, জনমে জনমে ডুবিয়াছি স্বামি।

গান শেষ হইলে হেমচন্দ্র ডাকিলেন, গোলাপ!

গো। হেম!

হে। আজ কত সুখ! হৃদয়ে সুখের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে। ভগবান কি এমনই দিন চিরকাল দিবেন?

গো। চিরকালের কথা ভাবি না—ভাবিবার অবকাশও নাই। আমি বর্ত্তমানেই সুখী। হেম! তুমি যখন তখন স্ত্রীর কথা বল, উহাতে আমি কষ্ট পাই।

হে। অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর।

গো। ছি, হেম! অমন কথা কি বলিতে আছে? আমি তোমার কিসের যোগ্যা। আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া কি উচিত?

হে। তুমি কিসের যোগ্যা? ইহপরলোকে সর্ব্বত্রই তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার যোগ্যা। বহু পুণ্য না থাকিলে তোমা হেন স্ত্রীরত্ন লাভ ভাগ্যে ঘটে না।

গো। অর্দ্ধাঙ্গিনী ত ভাই তোমার ঘরে। আমি জাতিচ্যুতা, সমাজপরিত্যক্তা বেশ্যা—আমি কি তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা?

হে। আবার তাহার কথা মুখে আনিতেছ কেন? গোলাপ! এ সুখের সময় সে দুঃখের কথা কেন?

গো। তাহার নাম করিলেও বুঝি তোমার দুঃখ হয়! ভাই, ইচ্ছা হইলে তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যাইতে পার! আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তোমার নাম লইয়া গহন বিপিনে যাইব। তথায় বৃক্ষপত্রে তোমার নাম লিখিব, তোমার ছবি আঁকিব, তোমার ভজনা করিব।

"কেন কষ্ট দাও গোলাপ? যাহাতে তোমার দুঃখ, রাগ বা অভিমান হইতে পারে, আমি এমন কর্ম্ম কেন করি, এমন কথা কেন বলি? আমার মরণই মঙ্গল—এই বলিয়া হেমচন্দ্র নিজের গলা নিজেই টিপিতে লাগিলেন। গোলাপ সভয়ে তাহার হাত ধরিল। গোলাপের অঙ্গস্পর্শে হেমচন্দ্রের শরীরে যেন তাড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইল। গোলাপ এই সময়ে হেমচন্দ্রকে আবার এক পাত্র সুরা দিল।

গো। দেখ, হাতে খরচের একটিও পয়সা নাই। কাল তুমি কিছু টাকা না আনিলে কিছুতেই আর চলিবে না।

হে। কুছ্ পরওয়া নাই! আমি কাল টাকা আনিব সেই ছুঁড়িটী অম্লান বদনে স্বীয় অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া দিবে। যতক্ষণ তাহার গাত্রে অলঙ্কার আছে, ততক্ষণ টাকার জন্য ভাবি না।

---o---

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

:•*০*•–

হেমলতার দুঃখ।

"ওলো হিমি! আমি আগেও ব'লেছি, এখনও বল্‌ছি, অমন স্বামীর মুখ পুড়িয়ে দিতে হয়। খবরদার! হেমা ছোঁড়া ঘরে এলেও তাকে গহনা দিস্‌নে।"

হেমলতা। পিসিমা! সকল কথা আমার সহ্য হয়, কিন্তু ওকথা আমাকে ব'ল না। গহনা কি আমার এতই বড় হ'লো?

দিগম্বরী ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় লাফাইয়া উঠিল, বলিল, "কি বলিস্? তোর সহ্য হয় না, তাতে আমার কি ব'য়ে গেল? আমি কি তোর আটচালায় বাস করি, না তোর ভাত খাই? ভাল কথা বল্লে আবার মন্দ হয়!"

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া হেমলতার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। আহা! সে সংসারে বুঝি কাঁদিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার আর কি সুখ আছে? স্বামী এখন প্রত্যহ বাটীতে আসেন না। যে দিন আসেন, সে দিন কেহ তাঁহাকে সহজ অবস্থায় দেখিতে পায় না— সকল সময়েই মাতাল থাকেন। হেমলতা একদিন স্বামীকে সুস্থ করিবার জন্য তাঁহার পদসেবা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু নির্ম্মম হেমচন্দ্র পদাঘাতে তাহাকে মর্ম্মপীড়িতা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র বাটীতে আসিয়াই হেমলতার অলঙ্কারাদি যাহা পাইতেন, তাহাই

লইয়া যাইতেন। বাটীতে দুই এক ঘণ্টা মাত্র অবস্থান করিতেন। যতক্ষণ হেমচন্দ্র বাটীতে থাকিতেন, ততক্ষণ হেমলতার উপর বিষম অত্যাচার করিতেন। পক্ষান্তরে হেমলতা স্বামীর মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। কিসে স্বামী সুখী হইবেন, কিসে তিনি সুস্থ হইবেন, হেমলতা তাহাই অহোরাত্র চিন্তা করিত। হেমলতা হেমচন্দ্রকেই সমগ্র জগত বলিয়া জানিত। হেমচন্দ্র ব্যতীত সংসারে যে আর কিছু আছে, হেমলতা তাহা বুঝিত না। হেমলতার ক্ষুদ্র হৃদয়মন্দিরে হেমচন্দ্র ব্যতীত অন্য দেবতা স্থান পায় নাই। হেমচন্দ্র তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তিনি বেশ্যাসক্ত, সুরামত্ত হইয়া তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অলঙ্কারাদি লইয়া যাইতেছেন—ইহাতেও হেমলতা হেমচন্দ্রের কোন অপরাধ দেখিতে পাইত না। হেমলতা ভাবিত, তাহারই পূজার অনুষ্ঠানের বুঝি কোন ত্রুটী হইয়াছে— নতুবা হেমচন্দ্রের ন্যায় গুণবান্ পতি তাহার প্রতি বাম হইবেন কেন? হেমলতা প্রতি পদে নিজেরই ত্রুটী দেখিত।

হায় হেমচন্দ্র! তুমি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যফলে হেমলতার ন্যায় স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছিলে। কিন্তু তোমার এ জন্মের এমনই দুষ্কৃতি যে, গৃহে রত্ন থাকিতেও তাহা চিনিতে পারিলে না, মণি ত্যাগ করিয়া কাচ গ্রহণ করিলে, দেবী পরিহার করিয়া রাক্ষসীকে হৃদয়ে স্থান দিলে, স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকের রৌরবে প্রবেশ করিলে। ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন না হইলে লোকে সাধ্বী স্ত্রী লাভ করিতে পারে না। হেমচন্দ্র স্বেচ্ছায় পদাঘাতে লক্ষ্মীকে দূর করিলেন।

হেমচন্দ্রের উপর দিগম্বরী ঠাক্‌রাণীর বিজাতীয় ক্রোধের কথা আমরা এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই বর্ণনা করিয়াছি। তাহার উপর

হেমচন্দ্র যতই কুপথগামী হইতে লাগিলেন, যতই হেমলতার উপর নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন, দিগম্বরী ঠাকুরাণী ততই ক্রুদ্ধা হইতে লাগিল। দিগম্বরী হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রায়ই পাইত না, কাজেই সব ক্রোধ হেমলতার উপরই প্রকাশ করিত। একে স্বামী-নিগ্রহ, তদুপরি দিগম্বরীর তাড়না, হেমলতাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

আমরা যে দিবস দিগম্বরী ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক হেমলতার লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিতেছি, উহার পূর্ব্ব রাত্রিতে হেমচন্দ্র আসিয়া হেমলতার নিকট হইতে অলঙ্কার লইয়া গিয়াছিলেন। দিগম্বরী জানিত, হেমচন্দ্র অর্থের প্রয়োজন না হইলে কদাচ বাটীতে আসিতেন না। কাজেই সে অলঙ্কার প্রদানের কথা তুলিয়া হেমলতাকে ভর্ৎসনা করিতেছিল।

হেমলতাকে রোদন করিতে দেখিয়া দিগম্বরী ক্রোধে অধিকতর জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "ওলো স্বামীসোহাগিনি! গায়ের গহনা খুলে দিতে লজ্জা বোধ করিস্ নি? অমন ভাতারকে আবার গহনা দেয়, চুলোর ছাই দিতে হয়।"

হেমচন্দ্রের নিন্দা হেমলতার বক্ষে শেলসম বিদ্ধ হইল। হেমলতা দিগম্বরী ঠাকুরাণীর পা দু'খানি জড়াইয়া বলিল, "পিসিমা যা বল্‌তে হয়, আমাকে বল, তাঁর নামে একটীও দোষ দিও না। পিসিমা—মা যে শিখিয়ে গেছেন, স্বামী দেবতা। যদি প্রত্যক্ষ দেবতা কেহ থাকেন, ত সে স্বামী। যদি কাহারও পূজা করিলে মুক্তিলাভ হয়, যদি কাহারও প্রসন্নতায় স্বর্গের দেবতারা প্রসন্ন হন, ত সে স্বামীর। এ ত তোমাদেরই শিক্ষা! আজন্ম ইহাই শিখিয়াছি, ইহাই মানি, ইহাই জানি, ইহাই বুঝি। তাঁহার গহনা তিনি লইয়াছেন, ইহাতে দোষ কি?

দি। ওলো! তোকে অত শাস্ত্র ছড়াতে হ'বে না। স্বামীর মতন স্বামী হ'লে মানি, নইলে দু' পা দিয়ে ছানি। এখনও বল্‌ছি, তুই সাবধান হ'। নইলে এর পর খাবি কি? এবার ঐ রকম করে সে বাড়ীতে এলে বিশ ঘা ঝাঁটা মারিস্‌। আমার কথা শুন, দেখিস্‌ ওষুধ কেমন।

হেমলতার আর বাক্যোচ্চারণ হইল না। সে নীরবে অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিল। দিগম্বরী অবশেষে বলিল, "ভাল কথা বল্‌ছি বাছা! আমরা চোখের উপর এ সব দেখতে পারবো না। যদি আমাদের কথা না শুন, তাহা হ'লে ভালয় ভালয় আলোয় আলোয় পথ দেখ। এখানে ও রকম ইত্‌রমো পোষাবে না।"

হে। আমি যে তোমার মেয়ে, আমাকে কোথায় তাড়িয়ে দিবে?

দি। আমার পেটের মেয়ে হ'লে, নুন খাইয়ে মারতুম। নইলে ডুবে মর্‌বার্‌ জন্য তাকে দড়ি কলসী কিনে দিতুম।

হে। ঠিক বলেছো পিসিমা, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

দি। ত্যাখ হিমি, সোজা কথা বল্‌ছি, মরতে হয়, অন্য জায়গায় গিয়ে মর্‌। আবাগের বেটীর সকলই মন্দ। মরেও আমাদের হাতে দড়ি দিতে চায়।

হে। পিসিমা, কথায় কথায় আমাকে চলে যেতে বল্‌ছো, কিন্তু তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে? আমি কোথায় কার কাছে যাব?

দি। তোমায় যম ভুলেছে, তা জানি। নইলে আমাদের বংশে যা কখন ঘটেনি, তুই তা ঘটাচ্ছিস কেন? আমাদের বংশে কেহ কখন গায়ের গহনা খুলে ভাতারকে দিয়ে পথের ভিখারী হয়নি। তোর শতেক দুর্গতি আছে!

হে। পিসিমা, তোমরা থাক্‌তে আমার দুর্গতি কেন হ'বে?

দি। অমন হতভাগাকে বাড়ীতে জায়গা দিলে সে বাড়ীর মঙ্গল নেই। তুই এবার যেদিন সে ছোঁড়াকে গহনা দিবি, সে মাতাল হয়ে এলে পাতে ভাত দিবি, সেদিন তোর একদিন কি আমার এক দিন। সেদিন তুইও জান্‌বি, এ বাড়ী থেকে তোর অন্ন উঠেছে।

হেমলতার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, স্বর্গগত মাতাপিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া নয়নজলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। দিগম্বরী ঠাকুরাণী হেমলতাকে কাঁদিতে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

•••:0:•••

বৈষ্ণবী ও হেমলতা।

ইহার পর একদিন হেমলতার হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না। হেমচন্দ্র কয়েক দিবস বাটীতে আদৌ আসেন নাই। আসিবেনই বা কেন? হেমলতার অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। এমন কি, তৈজসপত্রাদিও বন্ধক দিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, লইয়া গিয়াছেন। ভার্য্যা যে কি খাইবে, তাহা পর্য্যন্ত হেমচন্দ্রের চিন্তার বিষয় হয় নাই। মানুষ সঙ্গদোষে এমনই হয়—দেবত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যের পশুত্ব লাভ হয়। আবার সহবাসগুণে পাশব-প্রকৃতির লোক দেব-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আজি আর আহারের কোনই সংস্থান নাই। দিগম্বরী ঠাকুরাণী প্রলয়কারিণী ভীমা ভৈরবীরূপিণী হইয়া সংসারে অবতীর্ণা হইয়াছে। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে সে হেমলতার অভাবের কোন কথাই বলে না—কেবল হেমচন্দ্রের কুকার্য্যের কথাই বলিয়া থাকে। হেমলতা যে ঐরূপ মন্দপ্রকৃতি স্বামীর অনুরক্ত, তাহাকে গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া কুকার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করে, ইহার বর্ণনায় দিগম্বরী সহস্রমুখী হইয়া থাকে। কাজেই রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া হেমলতারও কোন সংবাদ লইতেন না। সংসারে এরূপ ঘটনা প্রায়শঃ ঘটিতে দেখা যায়। ভার্য্যার মুখে

অন্যের নিন্দা গ্লানি শুনিয়া অনেকেই ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময়ে বিষময় ফলোৎপাদনও হইয়া থাকে।

মানুষের যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন একে একে সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। হেমলতার ভাগ্যেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? দিগম্বরী ঠাকুরাণী সে দিবস হেমলতাকে খাইতে ডাকিল না। হেমলতা কপর্দ্দকশূন্যা, কাজেই তাহার আহার হইল না।

ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ভাস্করদেব আকাশের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন সময় ভাল হয়, তখন সকলেরই প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সূর্য্য মহাশয়েরও তাহাই হইল। তাঁহার পূর্ণ যৌবন—অনন্ত বিস্তৃত গগনরাজ্যের তিনিই একমাত্র অধিকারী; তাঁহার তেজে জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিষ্প্রভ, মনুষ্য দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে। স্বীয় বিক্রম প্রকাশার্থ ভানুদেব যথাশক্তি কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রকোপে দিঙ্মণ্ডল সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড রবি কিরণে জীবজন্তু ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে লাগিল। দিবাকরের ভয়ে প্রাণীকুল সন্তপ্ত ও ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে লুকায়িত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল।

হেমলতার আজ কিছুই আহার হয় নাই, এমন কি এক গণ্ডুষ জল পর্য্যন্ত তাহার মুখে যায় নাই। সে সমস্ত দিন শয্যায় শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ভাবিল, জন্মান্তরে নিশ্চয়ই সে মহাপাপ করিয়াছিল, নতুবা এমন হইবে কেন? কেন তাহার স্নেহময় জনক-জননী তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইবেন? কেন দেবসদৃশ স্বামীকে সে হারাইবে? এত সাধের সোণার সংসার ছারখার হইবে কেন? অবশেষে দিনান্তে আহারও তাহার ভাগ্যে জুটিল না কেন?

সংসারানভিজ্ঞা সরলা বালিকা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কেহ যে তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়, দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করে, এমন লোক সংসারে নাই। মুখ ফুটিয়া দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে পারে, এই বিশাল বিশ্বসংসারে তাহার এমন কেহ নাই। যে দিকে সে নিরীক্ষণ করে, সেই দিকেই দেখে, দিগন্ত-প্রসারিত ভীষণ মরুভূমি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—কোথাও এমন একটী পাদপও নাই যাহার ছায়াতলে বসিয়া সে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। সে সকলই শূন্যময় দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় বারি পতিত হইয়া শয্যা সিক্ত করিতে লাগিল। বুঝি তাহার এ রোদনের অন্ত নাই—ইহা আর ফুরাইবে না।

হেমলতা কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমেই যেন তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। বালিকা স্বপ্নে দেখিল, তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী জননী সস্নেহে তাহার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। একটা কালভুজঙ্গ তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জননী তাহাকে বিতাড়িত করিতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিল সম্মুখেই ভবদাসী বৈষ্ণবী দণ্ডায়মানা।

হেমলতা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। তখনও তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল। বহুকষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া সে বৈষ্ণবীকে বসিতে বলিল। ভবদাসী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকটে আসিয়া বসিল। হেমলতার আলুথালু বেশ, বিশুষ্ক বদন, অশ্রুভারাক্রান্ত লোচন, অযত্নসংরক্ষিত অলকাদাম, নিমিষের মধ্যে ভবদাসী বৈষ্ণবীকে বুঝাইয়া দিল যে, হেমলতা দারুণ মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছে।

ভবদাসী বৈষ্ণবী যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর প্রেরণায় হেমলতার নিকট আসিত, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভবদাসী যখনই আসিত, তখনই মিষ্ট কথায় হেমলতার চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিত। হেমলতার দুঃখে যেন সে কতই দুঃখিত, এরূপ ভাব প্রকাশ করিত। ভবদাসী ক্রমে ক্রমে হেমলতার প্রীতি-বর্দ্ধনে সমর্থা হইয়াছিল। হেমলতাও তাহাকে সহৃদয়া দেখিয়া কষ্টের কথা খুলিয়া বলিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিশেষরূপে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল। ভবদাসী ও হেমলতা পরস্পরে পসস্পরকে সই বলিয়া ডাকিত। ভবদাসী আসিয়াই বলিল, "সই! আজ তোমাকে এরূপ দেখ্‌ছি কেন? তুমি কি স্নান কর নাই?"

হে। না সই, স্নান করি নাই।

ভ। বাবু কি আসেন নাই?

হে। না।

ভ। কত দিন?

হে। চারি দিন।

ভ। খরচপত্র পাঠিয়েছেন?

হে। না।

ভ। ঐ ত! পুরুষগুলা বড়ই স্বার্থপর! একবার ভাবে না, যারা তাহাদের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে, তাঁদের দিন কি কষ্টে কাটে। কোন খোঁজ খবর নেই, চারদিন দেখা নেই, একি রকম কথা? ঘরে যে ভরা যুবতী বৌ রয়েছে, সে কি খাবে, কি পরবে একবারও ভাবে না। তা তুমি বলে সই এত কষ্ট সহ্য করে থাক, আমরা হ'লে কখনই পারতুম না।

হে। সই, আমার কষ্ট কই। তিনি সুখী হইলেই আমার সুখ। আমার নিজের সত্তা কোথায়?

ভ। আমরা অত কথা বুঝি না। আমরা বুঝি, আদান প্রদান সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। যেখানে তা নেই, সেইখানেই কষ্ট ও দুঃখ। আমি নিরবচ্ছিন্ন একজনের সুখের কথা ভাববো, আর সে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না, এও কি কখনও সম্ভব হয়?

হে। সই, তুমি অন্য কথা কও। তাঁহার নিন্দা আমার সহ্য হয় না। তিনি দেবতা, আমি সেবিকা, দেব-নিন্দা শুন্‌লে পাপ হয়।

ভ। সত্য. কিন্তু দেবতার নিকট সেবক, যা আশা ক'রে, প্রাণপণ সেবাতেও যদি তা না পায়, তাহলে দেবতার কি সে নিন্দা ক'রে না? মানুষের সহিষ্ণুতার ত একটা সীমা আছে?

হে। সই আমি অত কথা বুঝি না, তাই তোমার কথার সদুত্তর দিতে পারি না। তবে আমি দেবতার কাছ থেকে কোন বর প্রার্থনা করি না। দেবতার পূজা করবো, ধ্যান ধারণা করবো. এইমাত্র আমার কর্ত্তব্য বলেই জানি।

ভ। যাক্ ও কথা। হ্যাঁ সই, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নি?

হেমলতা নীরব রহিল। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া ভূপতিত হইল। ভবদাসী বৈষ্ণবী ইহাতেই হেমলতার মনোভাব বুঝিল। ভবদাসী বলিল "বহিন্! তোমার দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। এই কনকলতিকা দুঃখ-তাপে এইভাবে দগ্ধ হইবে, ইহা কি প্রাণে সহে? একটী সদাশয় ধনকুবেরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তিনি এইরূপ দুঃখিনীকেই সাহায্য করে থাকেন। তুমি যদি বল, তা'হ'লে তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা আন্‌তে পারি। এরূপ অর্থ-সাহায্য গ্রহণে আমি ত কোন দোষ দেখি না।"

হেমলতার দুঃখপারাবার আরও উথলিয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সই পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে তোমাকে পেয়েছি। তুমি আমার দুঃখে যে যথার্থ দুঃখী, তা'ও বুঝেছি। তোমার ঋণ জীবনেও শোধ করতে পারবো না। তবে ভাই, একটা কথা আছে। আমার স্বামী রহিয়াছেন, আমি অন্যের নিকট সাহায্য লইব কেন? আমাকে ওরকম কথা বল্লে আমার প্রাণে দ্বিগুণ ব্যথা লাগে। তোমাকে মিনতি করি, আর অমন কথা মুখে আনিও না।"

ভবদাসী বৈষ্ণবী অত্যন্ত চতুরা; বুঝিল, এরূপ উপায়ে হেমলতাকে হস্তগত করা সহজ হইবে না, কাজেই সে দিবস আর কোন কথা না বলিয়া স্বয়ং কিছু খাবার আনিয়া বিশেষ জেদ করিয়া হেমলতাকে খাওয়াইল। হেমলতা ভবদাসীকে স্বর্গের দেবী ভাবিল।

এই সংসারারণ্যে ভবদাসীর ন্যায় লক্ষ লক্ষ ভীষণ জীব বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের কবলে যে পতিত হয়, তাহার আর নিস্তার থাকে না। ইহারা হিংস্রক ব্যাঘ্র বা সর্প অপেক্ষাও ভীষণতর। ইহারা বিষকুম্ভপয়োমুখম্। কাজেই ইহাদিগের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় সহজে না পাইয়া লোকে অসতর্ক ভাবে ইহাদিগের গ্রাসে পতিত হয়। শ্বাপদাদি প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু ইহারা প্রচ্ছন্নভাবে, অতি যত্নে মনোভাব সংগোপন করিয়া, সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। লোকে মিত্র ভাবিয়া ইহাদিগের শরণাপন্ন হয়, ইহারাই তাহার প্রতিদানস্বরূপ প্রাণসংহার করিয়া থাকে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কি হইল ?

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতেছে। কাল কাহারও মুখাপেক্ষী-নহে। হৈমসিংহাসনাধিষ্ঠিত মণিমাণিক্যখচিত-মুকুটধারী ভূপেন্দ্রই হউন, আর জীর্ণবাসপরিহিত দুঃখদাবদগ্ধ শীর্ণকায় ভিখারীই হউন, সকলেই কালের অধীন। নিয়তিচক্রে সুখ দুঃখ সমভাবে বিঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু হেমলতার ভাগ্যে বুঝি সেই দুরতিক্রম্য কালের বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, নতুবা তাহার ভাগ্যে দুঃখের উপর দুঃখরাশি উপস্থিত হইতেছে কেন? দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ যদি কালের নিয়মে দেখা দিয়া থাকে, তাহা হইলে হেমলতার দুঃখের পর সুখ দেখা দিতেছে না কেন?

হেমচন্দ্র গোলাপকে লইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তিনি মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সকলই ভুলিলেন। গোলাপ ব্যতীত জগতের যে অস্তিত্ব আছে, সে ধারণাও তাঁহার বিলুপ্ত হইল। যে হেমলতাকে বড় সাধ করিয়া কমলমণি হেমচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই আদরের হেমলতার চিত্রও হেমচন্দ্রের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল। গোলাপই হেমচন্দ্রের ধ্যান জ্ঞান হইল—গোলাপই হেমচন্দ্রের জীবনসর্ব্বস্ব হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে বাটীতে আসাও বন্ধ করিলেন। যখন অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হইত, তখন হেমচন্দ্র বাটীতে যাইয়া পত্নীকে পীড়ন করিয়া অলঙ্কারাদি

লইয়া আসিতেন। হেমলতার ইহাতেও হেমচন্দ্রকে দেখিলে ভয় হইত না, বরং হেমচন্দ্র-সন্দর্শনে সে যেন হাতে স্বর্গ পাইত। হেমচন্দ্র যে সুখে আছেন, ইহাই জানিতে পারিলে—নিমেষের নিমিত্তও হেমচন্দ্রকে দেখিতে পাইলে—হেমলতা স্বর্গসুখানুভব করিত।

একদিন হেমলতা আহার করিতে বসিয়াছে। এমন সময়ে মদমত্তাবস্থায় হেমচন্দ্র আসিয়া তাহার স্বর্ণবলয় চাহিলেন। হেমলতা অম্লানবদনে কঙ্কণ খুলিয়া দিল। দিগম্বরী ঠাকুরাণী ইহা আর সহ্য করিতে পারিল না। হেমচন্দ্র তখন সুরামত্ত, দিগম্বরীর কথার দু একটা প্রত্যুত্তর প্রদানে বিরত হইলেন না। ইহাতে দিগম্বরীর অভিমানের আর সীমা রহিল না। সে পা ছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার রাসভ-বিনিন্দিত স্বরে প্রতিবেশীরা আকৃষ্ট হইল। রত্নাকর মুখোপাধ্যায় আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন, দিগম্বরীর চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যাপার বুঝিয়া প্রতিবেশীর কেহ বা হেমচন্দ্রের নিন্দা করিল, কেহ বা হেমলতার দোষ দিল, কেহ বা দিগম্বরীকে বলিল, "নিজের মান নিজে না রাখতে জান্‌লে ঐ রকম হয়। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হওয়া ভাল কি?" ইহাতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ক্রোধ ও অভিমান উভয়ই অধিকতর জ্বলিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদে রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় গৃহের ভিতরে আর অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি পত্নীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে শান্ত হইতে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, সে কিন্তু তাহা শুনিল না, হেমলতার সহিত সে আর এক মুহূর্ত্তও এক বাটীতে কিছুতেই থাকিবে না বলিল।

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্নীকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "হেমলতার অপরাধ কি? অপরাধ করিল হেমচন্দ্র, আর শাস্তি হইবে হেমলতার? ইহা কি উচিত? আর এক কথা, হেমলতা যুবতী, কলিকাতায় তাহার সহায় কেহ নাই। নিজের যুবতী কন্যাকে কেহ কি পথে বাহির করিয়া দিতে পারে?"

দিগম্বরী ক্রন্দনের সুরে উত্তর করিল, "ওগো! ঐ মেয়েটারই ত সব দোষ। ও যদি আমাদের কথার বাধ্য হ'ত, তাহ'লে ও... অমন দুর্গতি হবে কেন? সে পাজি ব্যাটা যেমন বখাটে হ'য়েছে, তেমনি তাকে জব্দ করতে হয়। মেয়েটার গায়ের সব গহনা নি... গেল, মেয়েটাকে পই পই ক'রে বারণ কল্লুম, সে তা শুন্‌লে না একে একে সব গহনাই খুলে দিলে। ব্যাটা একটা পয়সা দেয় না, ওকে আবার খেতে দিতে আছে? ওর মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।

র। এ যে তোমার বড় অন্যায় কথা। স্বামী যে রকমই হউ... না কেন, তাকে কি কেউ পরিত্যাগ করিতে পারে?

দি। না পারে অমন স্বামী নিয়ে থাক্। ছুঁচো ব্যাটার ... আস্পর্দ্ধা, আমাকে দু'কথা বলে? কেন আমি ওর খাই, না পরি? ব্যাটা মদ খেয়ে বাড়ীতে আস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, কবে আমাকে... বা দু'ঘা মেরে বস্‌বে। আমি ও বেটাকে কিছুতে আর বাড়ী... ঢুক্‌তে দে'বো না। এতে যা হয় হবে।

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবার আর দিগম্বরী ঠাকুরাণীর কথা... কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। অতঃপর দিগম্বরীর কথা... মতই কার্য্য হইবে বলিয়া তিনি তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। দিগম্বরীও ইহা চাহিতেছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া হেমলতার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। যেরূপ অবস্থাতেই হউক,

হেমচন্দ্রকে সে কখন কখন দেখিতে পাইত, সে দর্শনাশাও বিলুপ্ত হইল। হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাটীর দ্বারদেশ হইতে অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা হেমলতার প্রাণে সহ্য হইবে না। হেমলতা কাহাকেও কিছু বলিল না, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

উচ্চ বিচারালয় হইতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহা রহিত করিবার কাহারও সাধ্য থাকে না। দিগম্বরী যাহা চাহিতেছিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই দিলেন। অভীপ্সিত বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া দিগম্বরী ঠাকুরাণী শান্ত হইলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে যখন পৃথিবী জ্বলিতে থাকে, সেই সময়ে বিস্তৃত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পান্থ যেরূপ সুন্দর তড়াগসমীপে পাদবতলে সুশীতল ছায়ার আশ্রয় পাইয়া তৃপ্ত হয়, দিগম্বরী ঠাকুরাণীও তদ্রূপ তৃপ্ত হইল। এতদিনে পথ নিষ্কণ্টক হইল। হেমচন্দ্রের মুখ যে আর দেখিতে হইবে না, এই আশায় সে আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

আর হেমলতা? যেমন অন্ধকারের সহিত আলোকের সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত জলের সম্বন্ধ, তেমনই হেমলতার মনোভাবের সহিত দিগম্বরীর মনোভাবের সম্বন্ধ হইল। একদিকে দিগম্বরী যেরূপ আনন্দিতা, অন্যদিকে হেমলতা তদ্রূপ ম্রিয়মানা। হেমলতা সমস্ত সংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, এই বিস্তৃত সংসারে সে একাকিনী। আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। সে হাসিলে আর কেহ হাসে না, সে কাঁদিলে আর কেহ কাঁদে না। তাহাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলে, এমন লোক এ পৃথিবীতে নাই। হেমলতা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যে বাটীতে তাহার স্বামীর

স্থান নাই, সে বাটীতে তাহারঁও স্থান নাই। সে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিবে, স্থির করিল। একবার ভাবিল, একমাত্র তাহার দুঃখে দুঃখী সেই বৈষ্ণবী সই আছে। সে যদি এ সময়ে একবার আসে, তাহা হইলে উভয়ে পরামর্শ করিয়া একটা উপায় স্থির করে। সে আসিবে কি?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—•••:০:•••—
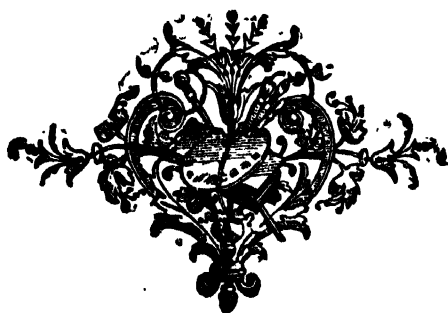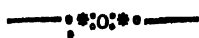
মন্ত্রণা।

পরদিবস ভবদাসী বৈষ্ণবী আসিল। মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি বলিয়া একটা শক্তি বুঝি প্রকৃতই আছে। নতুবা ভবদাসী বৈষ্ণবী উপস্থিত হইবে কেন? হেমলতা তাহার কথা ভাবিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল। তাহারই ফলে কি ভবদাসী আসিল? হেমলতা কি করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় যাইলে সে হেমচন্দ্রের দেখা পাইবে, উপর্য্যুপরি এইরূপ চিন্তাস্রোতে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। সে ভাবিল, একবার হেমচন্দ্রের দেখা পাইলে তাঁহার পা-দুখানি বক্ষে ধারণ করিয়া সকল সন্তাপ দূর করিবে। তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিবে, পদপ্রান্ত হইতে তিনি যেন তাহাকে আর ত্যাগ না করেন। এই বিস্তৃত সংসারে হেমচন্দ্রের আশ্রয় ব্যতীত তাহার আর স্থান কোথায়? সে কি একাকিনী, স্বাধীনভাবে কুলমান রক্ষা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে? সে ত সংসারের কাহাকেও চিনে না, জানে না। হেমচন্দ্র তাহাকে পায়ে ঠেলিলে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? হেমচন্দ্র-হীন হইয়া সে কি বাঁচিতে পারে? হেমলতার মনে কত ভাব-তরঙ্গই উঠিতে লাগিল। চিন্তাস্রোতে হেমলতা উদ্বেলিত হইল। তখন সে কায়মনোবাক্যে একবার বিপদতারণ সর্ব্বদুঃখনাশন ভগবানকে ডাকিল। বলিল—সর্ব্বসন্তাপহারী হরি! এ সময়ে

অভাগিনীর প্রতি সদয় হও। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। তুমি ত বিপদভঞ্জন—তবে কেন আমার এ বিপদ মোচন করিবে না? প্রভো! যখন পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী দুঃশাসনের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তখন তুমিই তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে। আমার সহায় সম্বল—এক পতি—তিনি ত বাম হইয়াছেন। তুমিও যদি বিরূপ হও, তাহা হইলে আমার আর উপায় কি? হরি রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমি বড় অভাগিনী—নতুবা সর্ব্ব-গুণাধর স্বামী আমার প্রতি বিমুখ হইবেন কেন। আমার পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাই বিপদের উপর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পাপিনীর কি পাপ মোচন হইবে না?

হেমলতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইল। সে সমস্ত দিন আহার করিল না—কেহ তাহাকে ডাকিল না—কেহ তাহার কোন সংবাদ পর্য্যন্ত লইল না। তখন হেমলতা ভবদাসী বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুল হইল। ভাবিল ভবদাসী আসিলে সে প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলিবে, আর তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বুকের বোঝা অনেকটা লঘু করিবে। ভবদাসীর হৃদয় যে কালকূটপূর্ণ, মুখে সুধা ক্ষরণ হইয়া থাকে, হেমলতা তাহা বুঝিত না। সরলা বালিকা ভবদাসীকে আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত ও সম্মান করিত। ভবদাসী আসিলে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সে কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবে, স্থির করিয়াছিল। তাই ভবদাসীর জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছিল।

ভবদাসী আসিলে, হেমলতা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। তাহার সে রূপ নাই—সে কমনীয় কান্তি নাই। কেশপাশ আলুথালু, দেহ অবসন্ন ও বিশুষ্ক। হেমলতার আকৃতি দেখিয়াই

ভবদাসী শিহরিয়া উঠিল। মনের সহিত শরীরের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! একদিনেই হেমলতার আকৃতির বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। হেমলতাকে দেখিয়াই ভবদাসীর করুণার সঞ্চার হইল, যে দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ভবদাসী হেমলতার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিল, আজি তাহা তিরোহিত হইল। হেমলতার মুখে এমন একটা ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, যাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়, মানুষ দয়ার্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। হেমলতাকে দেখিয়াই ভবদাসী বৈষ্ণবীর হৃদয়ে সু এবং কুপ্রবৃত্তির মধ্যে একটা মহাসংগ্রাম বাধিয়া গেল। শেষে সুপ্রবৃত্তিরই জয় হইল। ভবদাসী বৈষ্ণবী জমিদার মনোহর চক্রবর্ত্তীকে ভুলিল—অর্থের লোভ ভুলিল। তাহার হৃদয়ে স্বর্গের ছবি প্রতিফলিত হইল। সে সত্বর হেমলতাকে বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি সই! তোমার কি হইয়াছে? তোমার চেহারার এমন পরিবর্ত্তন কেন হ'ল? তোমার চোখ ফুলেছে, তুমি কি কেঁদেছ?"

মানুষের যখন বড় দুঃখ হয়, তখন কেহ যদি একটু আদর, একটু যত্ন করে, তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন শোকবহ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ভবদাসীর আদরে হেমলতার দুঃখাগ্নি তদ্রূপ জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির উত্তাপে কঠিন দ্রব্য যেরূপ বিগলিত হইয়া যায়, হেমলতার চিত্ত তদ্রূপ দ্রব হইল। হেমলতার বক্ষঃস্থল আবার নয়নাসারে সিক্ত হইল। হেমলতা কাঁদিয়া আকুল হইল। ক্রমে ভবদাসীর স্নেহে যে দুঃখ-সাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই আবার তাহা প্রশমিত হইল। ভবদাসী নানারূপ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করায় ক্রমে হেমলতা শান্ত হইল। তখন হেমলতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল।

ভবদাসী নীরবে সকল কথা শুনিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবদাসীর হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। এ ভবদাসী আর যেন সে ভবদাসী নহে। সে সকল কথা শুনিয়া বলিল, "ভাই! তোমার এই বয়স, এই রূপমাধুরী! তোমাকে একাকিনী কোথাও রাখিতে ভরসা হয় না। আমি গরীব, পর্ণকুটীর আমার আশ্রয়। তুমি যদি আপত্তি না কর, তথায় তোমাতে আমাতে থাক্‌তে পারি। এ বাড়ীতে তোমার আর তিলার্দ্ধ থাকা উচিত নয়।"

হে। সই! অভাগিনীর দুঃখে ব্যথা পায়, আমি ত্রিভুবনে এমন লোক দেখি না। শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তাই এই অসময়ে দুটা মিষ্ট কথা শুন্‌তে পেলুম। সই! এ বাড়ীতে তিনি ঢুক্‌তে পাবেন না, সুতরাং আমার এ বাড়ীতে মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়, আমি জানি। আমি থাক্‌বো না, তাও স্থির করেছি। তবু জন্মের মত পিশেমশায় ও পিসিমাকে ছেড়ে যাচ্চি, এটা ভেবেও অস্থির হয়ে পড়েছি। পিসিমা অযথা আমাকে গুরুদণ্ড দিলেন। আমি সকল কষ্ট সয়েছিলুম—তাঁর তাড়না লাঞ্ছনায় বিব্রত হ'লেও বাড়ী ছাড়তে কখন মন চায় নাই, কিন্তু তাঁকে—যিনি আমার হৃদয়ের দেবতা—তাঁকে যখন বাড়ীতে আস্‌তে দেবেন না, তখন আমি আর কেমন ক'রে থাকি? আমি তোমার বাড়ীতেই যাব। যদি তিনি তোমার বাড়ীতে আসেন, তা'হ'লে সেই পর্ণকুটীরই আমার পক্ষে রাজপ্রাসাদ হ'বে।

ভ। আমি তাঁর কথাই বল্‌ছিলাম। যে রাক্ষসী তাঁকে গ্রাস ক'রেছে, আমি তাকে চিনি। দেখা যাক, ভবদাসী বৈষ্ণবী জিতে, কি গোলাপসুন্দরী জিতে?

হে। সই! কারো দোষ দিও না—দোষ আমার অদৃষ্টের। আমি তাঁহার কাছে কি? চাঁদের কাছে জোনাকী, রৌদ্রের কাছে ক্ষীণ দীপালোক, গোলাপের কাছে ঘেঁটুফুল, হিমালয়ের কাছে বল্মীক, সমুদ্রের কাছে গোস্পদ। আমাকে তাঁহার মনে ধরিবে কেন? তিনি আমাকে যে পায়ে রেখেছিলেন, সে তাঁরই গুণ।

ভ। ভাই, মুখের উপর বল্লে তোষামোদ করা হয়। কিন্তু আমি সত্য বল্‌ছি, অনেক মেয়ে দেখেছি, তোমার মতন সতীসাধ্বী পতিব্রতা সরলা আমি আর কখন দেখিনি। ঐ যে কথায় বলে, সোণা আগুণে পোড়ালে খাঁটি হয়। আমার তাই হয়েছে। আমার প্রকৃত মনোভাব তোমাকে এতদিন বলি নাই, আজও বল্‌বো না। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি, আমার মন থেকে ময়লামাটী সব গিয়েছে—মনটা আমার যেন খাঁটি হ'য়েছে। সময় হ'লে আমার কথা তোমায় বল্‌বো—নতুবা পেটের কথা পেটেই থেকে যাবে। যদি কখন আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়, যদি কখন আমার পাপের মোচন হয়, তাহ'লে সকল কথা শুন্‌তে পাবে। তবে এখন থেকে আমি যে কুপথে আর যাব না, তা স্থির ক'রেছি।

হে। সই! তুমি কি পাপ করেছো? যার দয়া ধর্ম্ম আছে, তার আবার পাপ কি? আমার মতন মহাপাপী, এ সংসারে কে আছে সই? আমি পাপী না হ'লে আমার এমন দুর্গতি হ'বে কেন? তুমি পরোপকারী, তুমি ত স্বর্গের দেবী।

ভ। বোন্! আমার পাপের কথা শুন্‌লে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। তুমি সংসারের কিছুই জান না—কাজেই কিছু বুঝ না। যা'হোক, তুমি কখন্ যাবে? তোমার পিসেমশায়ের ও পিসিমার অনুমতি নিতে হ'বে কি?

হে। হ'বে বৈ কি? রাগের বশে তাঁরা যদি ঐরূপ বলে থাকেন, যদি সত্যসত্যই তাঁরা এ বাড়ীতে তাকে আস্‌তে বাধা না দেন, তাহ'লে বোন্, আমি যাব না।

ভ। ভাল! তুমি তাহ'লে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে রেখো, আমি আবার সন্ধ্যার সময় আস্‌বো। যা স্থির হয়, তাই করা যা'বে।

হে। দেখ সই, সন্ধ্যার সময় আসতে ভুলো না। আমি তোমার আশা-পথ চেয়ে থাকবো। তুমি এলে তবু যেন কিছু কষ্টের লাঘব হয়। তোমাকে দুঃখের কথা বলে প্রাণের বোঝাটা যেন কিছু হাল্‌কা হয়।

ভ। আসবো—নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কাছে এলে আমিও অনেক শান্তি পাই, চিত্তের মলিনতা দূর হয়, পবিত্রতায় হৃদয় পূর্ণ হয়। কোন্ অজ্ঞাত বলে তুমি আমার চিত্ত-সংশোধন করেছ, তা ব'লতে পারি না।

ভবদাসীর কথায় কোন অর্থই হেমলতা বুঝিল না—সে কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ে পাপের ছায়া কখন স্পর্শ করে নাই, কাজেই পবিত্রতা অপবিত্রতা প্রভৃতির অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল, বৈষ্ণবী তাহাকে ভাল-বাসে, তাই বুঝি তাহাকে ঐ সকল কথা বলিতেছে।

হেমলতার সরলতা দেখিয়া বৈষ্ণবীও বিস্মিতা হইল। অবশেষে সে যাইবার সময় হেমলতাকে অনেক বুঝাইল। হেমলতা যাহাতে সমস্ত দিবস উপবাস না করে, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি করিয়া প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবদাসী বৈষ্ণবী।

বস্তুতঃই ভবদাসী বৈষ্ণবীর চরিত্রে একটা মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। যে ভবদাসী হেমলতার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল, সে এক্ষণে হেমলতার প্রধান হিতৈষিণী হইল। কিসে হেমলতা বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবে, কিসে হেমচন্দ্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। কেবল তাহাই নহে। সঙ্গে সঙ্গে আরও এক প্রবল চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিল— মনোহর চক্রবর্ত্তী যদি হেমলতার কথা জানিতে পারেন, হেমলতা তাহার বাটীতে আসিলে ভূম্যধিকারী মহাশয় যদি কোনরূপ অত্যাচার করেন, তাহা হইলে সে কিরূপে হেমলতাকে রক্ষা করিবে? প্রবল প্রতাপ মনোহর চক্রবর্ত্তীর কবল হইতে হেমলতাকে মুক্ত করা কি তখন তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইবে না? বিশেষতঃ মনোহর চক্রবর্ত্তী যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত, যেরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাহাতে তাহার ন্যায় অসহায়া রমণীর কি প্রতিবন্ধকতা প্রদান সম্ভবপর হইবে?

ভবদাসীর অন্য চিন্তা—হেমচন্দ্রের উদ্ধার সাধন। হেমচন্দ্র যেরূপ প্রণয়োন্মত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সহজে সৎপথে পুনরানয়ন করিতে পারা যাইবে কি? তাহার পর, হেমচন্দ্র যদিই সুপথগামী হন, অথবা তাহার চেষ্টায় যদিই একবার তাহার বাড়িতে আসেন, তাহা হইলে তাহার ন্যায় কুলটার বাটীতে হেমলতার অবস্থানের জন্য হেমচন্দ্রের মনে কি কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইবে

না? অকারণে হেমলতাকে কলঙ্কিনী বলিয়া পরিচিতা হইতে হইবে না কি? হেমলতার তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। হেমলতার উপকার করিতে যাইয়া সম্যক অপকারই করা হইবে। ইহা কোনমতেই ত কর্ত্তব্য নহে। এদিকে হেমচন্দ্রকে বাটীতে প্রবেশ করিতে না দিলে হেমলতা তিলেকের নিমিত্ত যে তাহার পিতৃষসার বাটীতে থাকিবে, তাহাও বোধ হয় না। কাজেই হেমলতাকে এরূপ স্থানে রাখা কর্ত্তব্য, যথায় তাহার কোন বিষয়েই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকে। ভবদাসী বৈষ্ণবী ইহাই সদযুক্তি বলিয়া স্থির করিল। অনেক ভাবিয়া সে দর্জ্জিপাড়ায় কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাটির অভিমুখে গমন করিল।

কমলকুমার চট্টোপাধ্যায় একটা সওদাগর আফিসে মুৎসুদ্দির কার্য্য করেন। পরিবারের মধ্যে তাঁহার ভার্য্যা সুধামুখী, একটী ছয় বৎসরের পুত্র এবং একটী তিন বৎসরের কন্যা। কমলকুমার বাবু পরম হিন্দু। সুধামুখীও অতীব নম্রপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। ভবদাসী বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহাদিগের বাটীতে যাইত। ভবদাসীকে সুধামুখী বিশেষ ভাল বাসিত। সে খঞ্জনী হস্তে গাহিতে গহিতে কমলকুমার বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

হরি হরি হরি বল অনিবার।
যদি হ'তে চাও ভবসিন্ধু পার॥
দুরন্ত সাগর, তরঙ্গ অপার,
না দেখি তোমার কিছুতে নিস্তার,
চরণ তাঁহার, সংসারের সার
কররে শরণ, হইবে উদ্ধার॥

গীত সমাপনান্তে বৈষ্ণবী বলিল "জয় রাধে! ভিক্ষা দাও গো জননি।"

ভবদাসী বৈষ্ণবী হাসিতে হাসিতে এই কয়টী কথা বলিয়া অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল। ভবদাসীকে দেখিয়া সুধামুখী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! সব সময়েই ঠাট্টা!"

ভ। আমার মরণে আর তোমার লাভ কি? আমরা গরীব মানুষ, পেটের দায়ে ভিক্ষা করি, তা এতে এত মরণ টাঁকা কেন? তোমরা ভিক্ষা না দাও, এক দ্বার নয় শতেক দ্বার খোলা আছে।

সু। নাও, আর ফাজ্‌লাম করতে হবে না। কেমন আছ বল?

ভ। আছি ভাল, নইলে তোমাদের এত চোখ্‌ টাটাবে কেন? জীয়ন্ত মানুষটাকে যমের বাড়ী পাঠাতে এত সাধ হবে কেন?

সু। আমি কি তোমায় হিংসা করি? বরং তুমি আমায় হিংসা করতে পার?

ভ। কিসে?

সু। তোমার ঠাকুরজামাইয়ের জন্য। তুমি যে ওর লোভে ফের, তা কি আমি জানি না!

ভ। জান্‌বে বই কি? তোমার জান্‌বার বয়স, এখন আরও কত জান্‌বে? আমি একলা ঠাকুরজামাইকে হাত করতে পারচি না, আর একজনকে আন্‌তে চাই। হুকুম দেবে কি?

সু। সে আবার কে? তোমার এত লোকও জোটে!

ভ। জুটবে না? যে ফুলে মধু থাকে, সেই ফুলেই মৌমাছির ভিড় লাগে।

সু। জানি—মধু কত! এখন রহস্য থাক্, ব্যাপারখানা কি বল ত?

ভ। ব্যাপারখানা কিছুই নহে। খাটুতে খাটুতে তোমার জান্ গেল। তুমি যে শুচিবেয়ে, কিছুতেই যে সে বামুনের হাতে ভাত খাবে না। আমি একটী জানা শুনা বামুনের রাঙ্গা টুক্‌টুকে মেয়ে এনে দিব, সে তোমার গৃহস্থালি কাজ কর্ম্ম ক'রবে, রসুই ক'রবে রাখ্‌বে কি?

স্থ। বটে! এত দয়া কেন? আমি রাঙ্গা টুক্‌টুকে মেয়ে চাই না। আমি কি খাল কেটে কুমীর আন্‌বো?

ভ। আন্‌লিই বা, তাতে তোমারই কষ্টের লাঘব হবে। আমিও ত সেই চেষ্টাতেই আছি।

স্থ। মেয়েটীর কি জাত

ভ। বামুন।

স্থ। স্বভাব চরিত্র কেমন?

ভ। ঠিক তোমার মতন।

স্থ। আবার বিদ্রূপ।

ভ। আমি বল্‌ছি স্বরূপ।

স্থ। সধবা না বিধবা।

ভ। সধবা—কিন্তু নাইকো ধবা।

স্থ। সে কি রকম?

ভ। বল্‌তে ফাটে মরম।

স্থ। বাঃ রে আমার কবি!

ভ। জানি আমি সবি।

স্থ। দেখছি তাই, এখন হেঁয়ালী ছাড়, সত্য কথা বল।

ভ। মেয়েটীর দুঃখের অন্ত নাই। বয়স অল্প বটে, কিন্তু সতীলক্ষ্মী। এমন মেয়ে আমার জানে দেখি নাই। তা নইলে

তোমার বাড়ীতে আন্‌তে চাচ্চি। আমি ঠাকুরজামাইকে ত বেশ চিনি। নষ্ট দুষ্ট মেয়ে হ'লে তিনি যে শুধু মেয়ের নাক কেটে ঝামা ঘসবেন, তা নয়, আমার দশাও তাই করবেন। জেনে শুনেই তাকে তোমায় দিতে যাচ্চি দিদি। মেয়েটীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ। কিন্তু পোড়া বিধাতার বিচার নাই। নইলে তেমন স্বর্ণলতা মেয়েকে ত্যাগ করে তার স্বামী একটা বেশ্যা নিয়ে পড়ে থাক্‌বে কেন?

সু। তুমি তাহাকে পেলে কোথা?

ভ। আমি সব জায়গায় ভিক্ষা করে বেড়াই, কাজেই অনেকের সঙ্গে জানা শুনা হয়।

সু। যদি স্বভাব ভাল হয়, তা হ'লে আমার বোনের মতন যত্ন করবো। মেয়েটীর কি আর কেউ নেই?

ভবদাসী বৈষ্ণবী তখন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া সুধামুখীর চক্ষে জল আসিল। এ সংসারে মানুষই আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন হয়, এবং মানুষই দেবভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই সংসারেই দিগম্বরী ঠাকুরাণীও অনেক আছে, আর হেমলতা, সুধামুখীও অনেক আছে। যেখানে যে প্রকৃতি লোকের বাস সেইখানের অবস্থা তদ্রূপ—অর্থাৎ স্বর্গ ও নরকবৎ—হইয়া থাকে।

অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া ভবদাসীর অত্যন্ত আনন্দ হইল। ভবদাসী সুধামুখীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

---0---

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

-*০*-

ঔষধ প্রয়োগ।

গোলাপসুন্দরী সাধারণ গণিকার ন্যায় যে হেমচন্দ্রের অর্থশোষণের জন্য প্রথমে কৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। হেমচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার কথা গোলাপসুন্দরী প্রথমেই শুনিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে অর্থলাভের যে সম্ভাবনা ছিল, তাহা প্রথমে তাহার মনে উদয় হয় নাই।

প্রেমশাস্ত্রে যাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহারা জানেন, প্রথম দর্শনেই অনেক সময়ে অনুরাগের সূত্রপাত হইয়া থাকে। এই অনুরাগ যে সম্পূর্ণ রূপজ, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রণয়-পাত্রের গুণ বিচার করিবার যখন সুযোগ ঘটে নাই, যখন তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই, তখন দর্শনমাত্রেই হৃদয় আকৃষ্ট হয় কেন? প্রণয়ই বলুন, আর মোহই বলুন, সকলেরই একটা ভিত্তি আছে। দর্শনমাত্রেই অনুরাগের ভিত্তি রূপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই রূপেরই আবার পার্থক্য আছে। আমি যে প্রকার রূপের পক্ষপাতী, অন্যে হয়ত তদ্রূপ রূপের পক্ষপাতী হইতে না পারেন। আমি যাহাকে সুরূপ বলি, অন্যে তাহাকে সুরূপ না বলিতে পারেন। এই রূপ-বিচার সম্পূর্ণরূপে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমান ঘটনায় উভয়েরই রূপ রুচি বা বিচার সাপেক্ষ নহে, উভয়েই পরম সুন্দর ও সুন্দরী। হেমচন্দ্রের ও

গোলাপসুন্দরীর রূপ মনোহর ও নির্দ্দোষ। উভয়ে প্রথম দর্শনেই উভয়ের প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হইয়াছিল।

নবানুরাগে যাহা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। উহারা পরস্পরে এরূপ প্রণয়োন্মত্ত হইল যে, উভয়ের প্রণয় ব্যতীত আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত অন্য সকল বিষয়ই তাহাদিগের নিকট অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। নিমেষের অদর্শনে পরস্পরেই যেন যুগান্তর উপস্থিত হইল ভাবিত। এই অনুরাগ ক্রমে গাঢ় হইল। এ জগতে সকল বস্তুই যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, প্রণয়াদি ব্যাপারও তদ্রূপ নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকে। সৃষ্টি, স্থিতি, লোপ সকল বিষয়েই ঘটিয়া থাকে। অনুরাগেও তাহাই হয়। প্রথম দর্শনে অনুরাগের সঞ্চার, তৎপরে সহবাসে উহার পুষ্টিসাধন, তৎপরে আকাঙ্ক্ষা-পূরণে বিলোপ ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্র ও গোলাপসুন্দরীর সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছিল। উভয়েই যখন তদ্গতচিত্ত, তখন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাহার পর ক্রমেই অর্থাভাবের সূচনা হইল। এই অর্থাভাব যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের মোহনিদ্রাও ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল।

গোলাপসুন্দরী হেমচন্দ্রের প্রেমমুগ্ধা হইয়া ক্রমে ক্রমে বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিল। তাহার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল। ক্রমে তাহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। তাহার পর অলঙ্কারাদি, তাহাও একে একে অন্তর্দ্ধান হইল। তখনও গোলাপের চৈতন্যোদয় হইল না। হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে হেমলতার নিকট হইতে যে অলঙ্কারাদি লইয়া আসিত, তাহাও বিক্রয় করিয়া কোন কোন সময় চলিত। ক্রমে সেগুলিও গেল! তখন তৈজস পত্রাদি বিক্রয় আরম্ভ হইল। গোলাপ যে সৌধে বাস করিত, অবস্থান্তর ঘটায়

তাহাও বিক্রয় করিয়াছিল। তাহাকে ক্রমে এক খোলার ঘর ভাড়া করিতে হইল। এই সময়ে গোলাপের মনে এক একবার পূর্ব্বাবস্থার কথা উদয় হইত, কখন কখন অনুশোচনার দংশন অতি সামান্য-ভাবে অনুভব করিত। হেমচন্দ্রেরও যে হইত না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন ক্ষোভের উদয় হইত, তখন সর্ব্বসন্তাপহারিণী, মনুষ্যত্ববিলোপকারিণী, বোতলবাহিনী সুরাদেবীর ভজনায় উভয়ে ব্যাপৃত হইত। কিন্তু এমন করিয়া আর কয় দিন আত্মবিস্মৃতিকে স্থায়ী করা যায়। কাজেই মাঝে মাঝে পরস্পরে কলহ হইতেও লাগিল। হেমচন্দ্র অর্থোপার্জ্জনের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুরামত্ত, বেশ্যাসক্তকে কে বিশ্বাস করিয়া চাকুরী দিবে? কাজেই হেমচন্দ্রের সে ক্ষীণ চেষ্টা বিফল হইল।

একদিন হেমচন্দ্র ও গোলাপসুন্দরীর মধ্যে বচসা হইবার পর ভবদাসী বৈষ্ণবী তথায় উপস্থিত হইল। মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে ভবদাসীর সহিত গোলাপের পরিচয় হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। ভবদাসীকে দেখিয়াই গোলাপ বলিল, "ভাই! তুমিই বল দেখি, কার অন্যায়? মিন্‌সে এক পয়সা আন্‌বে না, আমি কোথা থেকে সংসার চালাই?"

ভবদাসী বলিল, "সত্যিই ত! পুরুষ মানুষ, রোজগার না কর্‌লে সংসার কি চলে? আহা! তোমার কি হালই হয়েছে?

গো। আমার কথা ছেড়ে দাও। নিতান্ত হতচ্ছাড়া না হ'লে আমার দশা এমন হ'বে কেন?

ভ। আচ্ছা তোমার সমস্ত গহনাপত্র কি গেছে? আহা! অত গহনা, অত ঐশ্বর্য্য, সব কোথায় গেল? ভাবলেও চোখ ফেটে জল আসে।

গো। সে সকল কথা মনে হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। —আমি লোকটার জন্য এত ত্যাগ করলুম, কিন্তু ও এখন কেবল আমারই দোষ দেখে।

ভ। তোমার দোষ? তা কাল যে কলি হ'য়েছে, একালে সবই সম্ভব! তোমার মতন মেয়েমানুষ বলে সব সইল। আমাদের হ'লে একদণ্ড মিল হ'ত না। হ্যাঁগা, চিরকালই কি এক হাতে তালি বাজে?

গো। সে কি রকম? আমি তোমার কথা বুঝতে পারলুম না। মিছে কথা বল্‌বো না দিদি, মিন্‌সেও সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, ওর মাগের গহনা পর্য্যন্ত সব বেচে ফেলেছে।

ভ। তোমার মতন ভালমানুষ হলেই ওসকল কথা বিশ্বাস করে। ওগো, আজ কালের মেয়ে, তোমার মতন কাঁচা কেউ নেই।

গো। না না দিদি, আমি বেশ জানি ওর মাগের কিছুই নেই। সে মাগী নাকি খুব ভালমানুষ।

ভ। তবু যদি আমি না জান্‌তুম।

গো। তুমি তাকে চেন নাকি?

ভ। আমি কাকে না চিনি? ভবদাসী যায় না, এমন বাড়ী নেই।

গো। ওর স্ত্রীকে দেখ্‌তে কেমন? খুব সুন্দরী নাকি?

ভ। ওগো—সুন্দরী—না.ছন্দরী। যে যাকে ভালবাসে সে, তাকে সুন্দরী দেখে!

গো। বটে! আচ্ছা তার গায়ে গহনা আছে?

ভ। কেন থাকবে না? তোমার মতন হাল্‌কা মেয়েমানুষ ত আর সে নয়।

গো। কি কি গহনা আছে?

ভ। বালা, তাগা, হার।

গো। তুমি স্বচক্ষে দেখেছ?

ভ। তবে কি আমি মিথ্যে বল্‌ছি?

ভবদাসী দেখিল ঔষধ ধরিয়াছে। আজ আর বাড়াবাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতটুকু ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, তাহা করিয়া ভবদাসী বিদায় গ্রহণ করিল। গোলাপসুন্দরী রাগে ফুলিতে লাগিল। ইহার ফলে, সে দিবস হেমচন্দ্রের সহিত গোলাপসুন্দরীর আবার বচসা হইল। হেমচন্দ্র যাহা বলেন, গোলাপের আর তাহাতে বিশ্বাস হয় না। হেমচন্দ্র বিষম বিপদে পড়িলেন। বলা বাহুল্য, সে দিবস উভয়েরই আহার হইল না। গোলাপ বলিল, হয় হেমচন্দ্র তাহার সহধর্ম্মিণীর সমস্ত অলঙ্কার লইয়া আসুক, নতুবা পুনরায় সে স্বীয় ব্যবসায় চালাইবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•:০:•—

উভয় সঙ্কট।

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সমস্ত কথা শুনিলেন। তিনি হেমলতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। হেমলতার কথা ভাবিয়াই তিনি আকুল হইলেন। দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে তিনি অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু দিগম্বরী ঠাকুরাণী কিছুতেই হেমচন্দ্রকে বাটীতে আসিতে দিতে সম্মত হইল না। একেই হেমচন্দ্র তাহার চক্ষুঃশূল ছিল, তাহার উপর চাকুরী-ত্যাগ, সুরাপান, বেশ্যাগমন প্রভৃতিতে দিগম্বরীর ক্রোধের আর পরিসীমা ছিল না। আবার যখন হেমচন্দ্র একে একে হেমলতার অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন হেমচন্দ্রকে আদৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবার ইচ্ছা রহিল না। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও হেমচন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের স্বপক্ষে তিনি যে সকল তর্ক উপস্থিত করিলেন, দিগম্বরী একে একে তাহা খণ্ডন করিল। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় কাজেই নীরব হইলেন।

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বরী ঠাকুরাণীতে যখন হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে হেমলতা তথায় উপস্থিত হইল। হেমলতার আকৃতির পরিবর্ত্তন ও মুখের ভাব দেখিয়াই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "মা! কি মনে করে?"

হেমলতা অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল টস্ টস্ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। হেমলতার এই নীরব উত্তরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধিকতর মর্ম্মক্লিষ্ট হইলেন।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী বলিল, "বুড়ো হ'লে মানুষের ভীমরতি হয়, তোমারও দেখ্‌ছি তাই হ'য়েছে।"

র। কেন, আবার আমার অপরাধ কি হ'ল?

দি। কিজন্যে ও এসেছে, তা বুঝতে পারচো না?

র। না।

দি। তাতেই বলি, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। শুনলুম, মেয়ে বলে যদি সেই হেমা ছোঁড়াকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দিই, তাহ'লে ও বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তাই আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত করবার জন্য আমি ঘরে আসবার সময় ওকে ডেকে এসেছিলুম।

র। সেকি কথা? সমস্ত মেয়ে বাড়ী ছেড়ে যাবে কি?

দি। আজ কাল্‌কার মেয়ে, ভাতার ছাড়া আর কিছু জানে না। ওর ও ধনুর্ভাঙ্গা পণ।

র। ছি মা হেমলতা! অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। হেমচন্দ্র ইদানীং অত্যন্ত অসচ্চরিত্র হ'য়েছে। বাড়ীতে যখন আসে, তখন সুরামত্ত অবস্থায় থকে। তার পর, তোমার সমস্ত গহনা লইয়া গেছে। দিন কতক বাড়ী আসা বন্ধ করলেই, সে টিট হয়ে যাবে। তোমার পিশিমার কথা শোন।

হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে হেমলতা লজ্জাবশতঃ কখন রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে কোন কথাই বলে নাই। কিন্তু আজ সেই লজ্জায়ও তাহার মনোভাব গোপন করিতে পারিল না। 'মানুষের হৃদয়ে

যখন দারুণ আঘাত লাগে, যখন সে শোক বা দুঃখে বিহ্বল হয়, তখন অবরোধ বা বাধা-বিঘ্ন মানে না, মর্ম্মকথা প্রকাশ হইয়া থাকে। হেমলতারও তাহাই হইয়াছিল, তাই সে মুখ ফুটিয়া রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে বলিল, "তিনি বাড়ীতে আস্‌তে চাইবেন, আর তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'বে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমি বাড়ীর ভিতর থাক্‌বো, অথচ তিনি বাড়ীর ভিতর আস্‌তে পাবেন না, অপমান হ'য়ে ফিরে যাবেন, এটা আমি কি ক'রে দেখ্‌বো ?

হেমলতার কথা শেষ হইতে না হইতে দিগম্বরী স্বামীর প্রতি উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি ত প্রথমেই বলেছি, নিজের মান নিজের কাছে! আজ কাল্‌কার মেয়েরা কি তেমন যে, গুরুজনের কথা শুনবে ? আজ আমার কেষ্ট যদি বেঁচে থাকতো, তা হ'লে হেমলতা কি অবাধ্য হ'তে পারতো ?" এই কথা বলিতে বলিতে দিগম্বরী নাকিসুরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

হেমলতা বলিল, "পিসিমা, আমি কখনই তোমাদের অবাধ্য হই নি। তোমরা আমার মুখের দিকে একবার চাইলে না, এই বড় দুঃখ।

দি। তুই আর নাক নেড়ে কথা কস্‌নি। তোকে দেখ্‌লে গা জ্বলে যায়। সে অলক্ষণে, হাড়হাবাতে ছোঁড়াটা তোকে নাস্তানাবুদ করেচে, আর তুই তার জন্য মরচিস্! তার অপমান তোর সহ্য হয় না! আজ কালকার মেয়েদের পাকাম দেখ্‌লে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠে। তোরই ভালর জন্য বল্লুম, তুই কি না কিছুতেই কথা শুনবি নি। মর্ মর্ মর্! এখনই মর্, সকল আপদ চুকে যাক্। শোন্ হিমি! আমি বলছি, কিছুতেই হেমা ছোঁড়াকে

বাড়ীতে ঢুকতে দেবো না। এ দিগম্বরীর পণ। হয় এস্পার, নয় ওস্পার হ'বে। হেমা বাড়ীতে এলে আমি বাড়ী থেকে চলে যা'ব।"

স্ত্রীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাঙনিষ্পত্তি হইল না। তখন হেমলতা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে দিগম্বরীর ক্রোধ অধিকতর বৃদ্ধি হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নীরব দেখিয়া হেমলতা বলিল, "আমি আপনাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করি। আমার দোষ মার্জ্জনা করবেন।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, "হেমলতা! তুমি আমার বিনানুমতিতে বাটীর বাহির হইও না। দেখি, তোমার থাক্‌বার উপযুক্ত কোন স্থান পাই কি না।

এমন সময়ে ভবদাসী বৈষ্ণবী উপস্থিত হইল। ভবদাসী সকল কথা শুনিয়া কমলকুমার বাবুর বাড়ীর কথা বলিল। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় কমলকুমার বাবুর নাম শুনিয়া বলিলেন, "তাঁহার নাম শুনেছি। লোকটী অতি সজ্জন। যদি হেমলতা সেখানে থাকে, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আচ্ছা, আমি একবার কমলকুমার বাবুর সহিত দেখা করবো। তাহার পর যা হয়, করা যাবে।

ভবদাসী বলিল, "আজই চলুন না কেন? আজ রবিবার, তিনি বাড়ীতে থাক্‌বেন।"

মনুষ্যকে অনেক সময়ে অবস্থার দাস হইতে হয়। যে হেমলতাকে রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিশেষ স্নেহ করিতেন, যে হেমলতার পিতার অন্নে বহুদিবস তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই হেমলতাকে অন্যের বাটীতে রাখিবার প্রস্তাবে সম্মতিদানেও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদ্‌পিণ্ড যেন উৎপাটিত হইল। কিন্তু কি করিবেন? এক

দিকে প্রণয়িনী ভার্য্যা—অপর দিকে শ্যালক-দুহিতা। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া—অনিচ্ছা সত্বেও—ঐরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে হইল। ইহাতে কেহ যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে স্ত্রৈণ্য আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন, করুন। কিন্তু আমরা জানি, সংসারে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহা প্রতিরোধ করিবার উপায় থাকে না, যাহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেও রোধ করিতে পারা যায় না। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়েরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি জানিয়া শুনিয়া অন্যায় কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। কারণ, উপায়ান্তর ছিল না, তিনি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

--*o*--

বৈষ্ণবীর চাতুরী।

হেমলতা যে ভবদাসী বৈষ্ণবীর সাহায্যে কমলকুমার বাবুর বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তাহা শুনিতে বাকি রহিল না। তিনি ভবদাসীর উপর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। ভাবিলেন, ভবদাসী এত দিন তাঁহার অর্থশোষণ করিয়া অবশেষে পাখীটীকে উড়াইয়া দিল। আশার যে ক্ষীণ সূত্র জমিদার মহাশয় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও ছিন্ন হইল, সুতরাং জমিদার মহাশয়ের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না।

যে কুলের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দীনদয়াল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, সেই কুলে কলঙ্ক লেপন করণাভিপ্রায়ে মনোহর বাবু এত দিবস চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যদি হেমলতাকে এক দিবসের নিমিত্ত তিনি অঙ্কশায়িনী করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মনোরথ সফল হইবে। মনোহর চক্রবর্ত্তী প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পশুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, বিবেকের দংশন পর্য্যন্ত অনুভূত হইত না। নতুবা হেমচন্দ্রের অধঃপতন সাধন করিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না কেন? হেমচন্দ্রের অধঃপতনে, হেমলতার নিগ্রহভোগে, তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থ হওয়া উচিত ছিল। নরাকারে পশু না হইলে বালিকার ধর্ম্মনাশে তিনি ব্যগ্র হইবেন কেন?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন ভবদাসীকে দণ্ডিত করিবার সঙ্কল্প স্থির করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৈষ্ণবী স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অদ্য ভবদাসীর বেশভূষার পারিপাট্য সমধিক। বৈষ্ণবীকে দেখিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "কি বাবা! ঘু ঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।"

ভ। দেখিছি বৈ কি, নইলে ফাঁদে ফেল্লুম কেমন ক'রে?

ম। তোমার আর রসিকতায় কাজ নেই। তুমি নেমক্-হারাম। সিন্নিও খাও, ভরাও ডুবাও।

ভবদাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মেয়েমানুষ, নেমক্‌হারাম হয়, এই কথা আজ আপনার মুখে প্রথম শুনলুম। সিন্নি খেয়ে ভরা আমি ডুবাই নাই। আমি আপনার মঙ্গলই ক'রেছি।

ম। আর আমার মঙ্গল ক'রে কাজ নাই। তুমি যেরূপ পাপিষ্ঠা, তাতে তোমার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

ভ। আপনারা বড়লোক, যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আপনারা কুলবতীর কুলনাশ করিতে উদ্যত হয়ে পুণ্যাত্মা. আর আমি তাতে যোগ দিই নাই বলিয়া পাপিষ্ঠাত বটেই।

ম। দেখ ভবদাসি! সকল-বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সহিষ্ণুতারও আছে। তুমি আমাকে সেই সীমা অতিক্রম করাচ্চ। সাবধান!

ভবদাসী বুঝিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। শক্ত কথায় তিনি নরম হইবেন না। কাজেই ক্রন্দনের সুরে বলিল, "হজুর! আমার নিতান্ত মন্দকপাল। নতুবা যার জন্য চুরি করি, সেই চোর বলবে কেন?

ম। তুমি আমার জন্য কি করেছ? তুমি আমার পয়সা খেয়েছ, আবার আমারই অভিষ্ট সাধনে বাধা দিচ্চ!

ভ। কিসে ?

ম। তা কি জান না ?

ভ। না।

ম। হেমলতাকে কোথায় রেখেছ ?

ভ। একটী সচ্চরিত্র ধনবানের বাড়ীতে।

ম। এখানে আনলে না কেন ?

ভ। আপনার ভয়ে।

ম। তবে আমায় কবলিত কর্‌বে বলে টাকা নিলে কেন ?

ভ। তাও আপনার মঙ্গলের জন্য।

ম। বুঝিলাম না।

ভ। সময় হ'লে বুঝতে পারবেন।

ম। আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাই না।

ভ। তবে কি চান ?

ম। হেমলতাকে।

ভ। সবুরে মেওয়া ফলে। পুরুষগুলা—বিশেষতঃ বুড়াগুলা—বড় ব্যস্তবাগীশ হয়।

বৈষ্ণবীর এই আশাপ্রদ বাক্যে মনোহর চক্রবর্ত্তী যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "তবে কি তুমি আমার হাতে হেমলতাকে দিবার জন্য ঐরূপ কৌশল অবলম্বন ক'রেছ ?"

ভ। "যার নুন খাই, তার গুণ গাই।" আমরা নেমকহারাম নই।

ম। অপরাধ মার্জ্জনা কর বৃন্দে।

ভ। ছি! ছি! অমন কথা বলতে আছে ? আপনি একে ব্রাহ্মণ, তাতে বড়লোক। ওরকম কথা আমাদের শুন্‌লে যে পাপ হয়।

ম। তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো ভবদাসি! আমি কৈবল হেমলতাকে চাই।

ভ। বনের পাখী কি সহজে পোষ মানে? ব্যস্ত হ'বেন না, আমি তাকে প্রথমে বশে আনি, তারপর ইচ্ছামত বুলি বলাব।

ম। বেশ! গোলাপের কোন কথা জান?

ভ। আপনার গোলাপ যে শুকিয়ে যাবার মতন হ'য়েছে।

ম। তাতে আমার কি?

ভ। এতেই ত বলে পুরুষ নিষ্ঠুর।

ম। ভবদাসি, তুমি ভুল বুঝেছ। সংসারে অসংখ্য কীট অলক্ষ্যে মানুষের পদতলে পড়ে প্রাণত্যাগ করছে, তা বলে কি মানুষ পথ চল্‌বে না?

ভ। তবে হেমলতার ভাগ্যেও কি তাই ঘটবে?

ম। তুমি সকল বৃত্তান্ত জান না। আজ তোমাকে মনের কথা বলি শুন। আমি প্রেমান্ধ যুবক নহি। হেমলতার কুলনাশে আমার মুখ উজ্জ্বল হ'বে বলেই আমি এত চেষ্টা করছি। হেমলতার শ্বশুর আমাকে অপমান করেছিল। তারই শোধ দিবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব পণ করেছি। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'লেই হ'ল।

ভ। এখন বুঝেছি। আপনার এমন প্রতিজ্ঞা যদি পূর্ণ ক'রতে না পারি, তা হ'লে আমার জীবনটাই বৃথা হ'বে।

ম। এখন বুঝলে! আজ তুমি পঞ্চাশ টাকা লও। সাবধান, আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ক'রো না। সাধ ক'রে আগুনের সঙ্গে খেলা ক'রো না।

মনোহর চক্রবর্ত্তীর এই ভীতিপ্রদর্শনে ভবদাসীর মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা জানি না। তাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সে

সহজে ভীতা হইবার পাত্রী নহে, ইহা আমরা জানি। যাহা হউক, সে অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। হয় ত মনে মনে ভাবিয়াছিল, পুরুষগুলা অত্যন্ত নির্ব্বোধ। ইহারা স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির কণামাত্র যদি পাইত, তাহা হইলে সসাগরা ধরা পদানত করিতে পারিত।

ভবদাসী চলিয়া যাইবার পর দেওয়ানজী আসিলেন। জমিদার মহাশয় বলিলেন, "দেওয়ানজী! এবার বুঝি ভগবান সহায় হইয়াছেন। আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথ সুগম হইয়াছে।"

দে। প্রতিবিধিৎসা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানুষের কুলমানই—সারবস্তু। লোকে কথায় বলে,—যাক প্রাণ থাক মান। দীনদয়াল সেই মানে আঘাত করিয়াছিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে। পিতার পাপ সন্তানে অর্শে।

ম। ঠিক বলিয়াছ। আমি যে জাল বিস্তার করিয়াছি, ইহাতে আর অব্যাহতি নাই। দেখিব, কেমন করিয়া দীনদয়ালের কুলে কালী দেওয়া নিবারিত হইতে পারে।

দে। হুজুর কি সব ঠিক করিয়াছেন?

ম। নিশ্চয়ই! মনোহর চক্রবর্ত্তীর কখন লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না। হেমচন্দ্র অধঃপাতে গিয়াছে, এখন বাকী আছে, তাহার স্ত্রী—দীনদয়ালের পুত্রবধূ। তাহার জাতি গেলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাক্যাবসান হইতে না হইতে তারের সংবাদ লইয়া এক পিয়ন উপস্থিত হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠ করিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ হইল, কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাবান্তর দর্শনে দেওয়ানজী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি?"

ম। সর্ব্বনাশ! আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, সংসারের একমাত্র-গ্রন্থি—প্রাণাধিকা কন্যা শৈল বিষম পীড়িতা। সত্বর বাটী প্রত্যাগমন করিতে হইবে সংবাদ আসিয়াছে।

দে। তাহা হইলে আর কালাবিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; কলিকাতা হইতে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও লইয়া যাওয়া হউক।

ম। তুমি এখনই সমস্ত বন্দোবস্ত কর। আমি আর তিলার্দ্ধও কলিকাতায় থাকিতে পারিব না।

বলা বাহুল্য, সেই দিবসেই তাঁহারা হরিহরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুধামুখী ও হেমলতা।

মাঘ মাস। দারুণ শীত। দ্বিতীয় তিথি। আকাশে চন্দ্রদেবের উদয় হয় নাই, অথচ কোটী কোটী তারকা প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির ন্যায় বিরাজিত। এক চন্দ্রে যে তমঃ নাশ করে, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রে তাহা পারে না। প্রকৃতিসতী অন্ধকার ও আলোকের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছেন। শীতের প্রকোপে জীবজন্তু জড়বৎ অবস্থান করিতেছে। রাত্রি নয়টা—পথে বিপুল জনসঙ্ঘ আর দেখা যাইতেছে না। কমলকুমার বাবুর বাটীতে হেমলতা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। হেমলতার চক্ষে নিদ্রা নাই। অহর্নিশ যে চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, আরামদায়িনী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীও তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সংসারের ইহাই নিয়ম। মনুষ্যের যখন সময় মন্দ হয়, তখন সকলেই তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া থাকে।

এখনও হেমলতা গৃহকার্য্য করিতেছে দেখিয়া সুধামুখী তাহাকে ডাকিলেন। হেমলতা আসিলে তিনি বলিলেন, "এরকম করলে তুমি আর ক দিন বাঁচবে? যে কাজ তোমার নয়, যাহা দাসীতে করবে, তাহাও তুমি কর কেন?"

হে। দিদি! দাসীরও ত প্রাণ, দেহ আছে। বিশেষতঃ সে আবার বুড়ী। কাল প্রাতে সে যখন এই দারুণ শীতে কাজ করবে,

তখন তার কত কষ্ট হবে? এই কাজ করতে আমার যে কষ্ট হয়, তার আমাপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট হ'বে।

সু। লোকের কষ্ট নিবারণ করা ভাল। কিন্তু তার সঙ্গে নিজের দেহও রক্ষা করতে ত হ'বে?

হে। দিদি! পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছি, তাই এ জন্মে এত কষ্ট পাচ্চি। আমার মত দুঃখিনীর জীবনের মূল্য কি? এ দেহ গেলেই মঙ্গল। যদি আমার সামান্য শক্তিতে কা'রও কিছুমাত্র উপকার হয়, তা হ'লে আমার তাতেই আনন্দ।

সু। আচ্ছা! তুমি কাল রাত্রিতে খাওনি কেন? কে একজন পুরুষ মানুষ এসেছিল, তুমি যত্ন করে তোমার মুখের অন্ন তাকে খাইয়ে সমস্ত রাত্রি অনাহারে ছিলে। সে লোকটা কে? সে লোকটাকে দেখে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছিলুম। যদি চাটুয্যেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ না যেতুম, তাহ'লে সকাল বেলাতেই তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতুম।

হেমলতা অধোবদনে রহিল। তাহার গণ্ড বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ধরাতলে পড়িল। সুধামুখী ইহা দেখিতে পাইলেন, হেমলতাকে অধোবদনে নীরবে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিতা হইলেন। তিনি এই কয়েক দিবসে হেমলতার যেরূপ স্বভাব চরিত্র দেখিয়াছেন, তাহাতে তাহার চরিত্রের উপর সন্দিহান হইবার কোন কারণই দেখিতে পান নাই, বরং তাহার সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতিতে মুগ্ধই হইয়াছেন। হেমলতা যে কুলটা, সাধুতার ভান করিয়া অসাধুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে সুধামুখীর কোনমতেই প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং তিনি পুনরায় তাহাকে বলিলেন, "চুপ করে রইলে যে! আমি যতদূর

বুঝেছি—যদি আমার বুদ্ধিভ্রংশ না হ'য়ে থাকে—তাতে তোমাকে কোনমতেই কুপথগামিনী মনে হয় না। তবে লোকটা কে, এবং তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই তুমি আজ আমাকে ব'ল নাই কেন, এই সকল কথা আপনাপনি মনে উঠছে! হেমলতা! তুমি আমাকে তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতন জ্ঞান কর, তাহা আমি জানি। আমার কাছে কোন কথা গোপন করিবার কারণ নাই। তুমি সুশীলাই হও, আর দুঃশীলাই হও, আমি যখন তোমাকে ছোট বোনের মতন ভাবি, তখন কখনই তোমাকে ত্যাগ করবো না। তোমার ঐ সরলতাপূর্ণ মুখখানি, কচি ছেলের মতন চাহনি—ওতে কখনই দুষ্টামী থাকতে পারে না। তুমি গোপন ক'র না, স্পষ্ট করে বল, কে কাল রাত্রিতে এসেছিল?"

হেমলতা আর স্থির থাকিতে পারিল না। যে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না ভাবিয়াছিল, সুধামুখীর স্নেহপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া তাহা আর গোপন রাখা সম্ভবপর হইল না। সে অধোমুখে কম্পিত কণ্ঠে বলিল "আ—মা—র স্বা—মী!"

সুধামুখী ইহা শ্রবণ করিয়া হেমলতাকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার স্নেহ প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিল। যাঁহাদিগের হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, তাঁহাদিগের সম্মুখে কোন পবিত্রভাবের বিকাশ হইলে, তাঁহাদিগের হৃদয় গলিয়া যায়—স্বর্গের জ্যোঃতিতে হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়—নয়নপ্রান্ত হইতে প্রেমাশ্রু স্বতই ছুটিতে থাকে।

সুধামুখীর অত্যন্ত আনন্দ হইল। ভাবিলেন, হেমলতা কি দেবী? এত অল্পবয়সে এরূপ পতিভক্তি নয়নগোচর হয় না। সে নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্টা হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাকে দেখিলেও

জন্ম সার্থক হয়। যে বাটীতে তাহার পদধূলি পতিত হয়, সে বাটী পবিত্র হইয়া থাকে।

সুধামুখী মনে মনে হেমলতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেও তাহাকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "দেখ ভাই! তোমার সবই বাড়াবাড়ী। যে স্বামী অত কষ্ট দিয়েছেন, তাঁকে, আবার যত্ন করা কেন?"

হে। দিদি! অমন কথা ব'লো না। আমি তোমাদের পদাশ্রিতা, কিন্তু এ রকম কথায় আমি মনে ব্যথা পাই। তাঁহার দোষ এক তিলও নাই। তিনি আমাকে কিছুই কষ্ট দেন নাই—আমার কর্ম্মফল, আমি ভোগ করছি। তিনি বরং আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। আমার ন্যায় হতভাগিনী যদি তাঁহার স্ত্রী না হ'ত, তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি সুখী হ'তেন। নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ দেখেছেন, তাই আমাকে ত্যাগ করেছেন।

সুধামুখী বুঝিলেন, হেমলতা আবেগভরে অন্তরের কথাই বলিয়াছে। তাহার কথায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। তিনি বলিলেন, "হেমলতা! জানি না কোন্ পাপে ভগবান তোমাকে এরূপ শাস্তি দিতেছেন। যা' হউক, অতঃপর তোমার স্বামী আসিলে, তুমি নিজে না খেয়ে তাহাকে খেতে দিও না। প্রত্যহ একজনের চাউল বেশী লইবে। যেদিন তিনি আস্‌বেন, সেদিন সেই অন্ন তাঁকে দিও।

হে। দিদি! আমার জন্য তোমাদের কত ক্ষতি হচ্চে। তার উপর আবার রোজ একজনের ভাত ফেলা উচিত নয়। তিনি কবে আস্‌বেন, কবে না আস্‌বেন, তা'র কিছুই স্থিরতা নাই। যদি প্রত্যহ আস্‌তেন, তাহ'লে তোমার কথামত কাজ করা ভাল ছিল।

সু। এবার এলে তুমি আমাকে ডেকো, এবং প্রত্যহ আসবার জন্য অনুরোধ করবো।

হে। দিদি তোমার দয়া অসীম কিন্তু তিনি এলে তোমাকে ডাকা সম্ভবপর নয়। তিনি তাহ'লে লজ্জায় আর এ বাটীতে আসবেন না।

সু। কেমন করে বুঝলে?

হে। কাল কিছুতেই বাড়ীতে আসতে চান নাই। সকলে শুয়েছে দেখে, তবে বাড়ীর ভিতর এসেছিলেন। পাছে কেউ দেখতে পায়, এই জন্য অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। তুমি তাঁকে দেখেছিলে, কিন্তু তিনি তোমাকে দেখতে পান নি, তাই রক্ষা।

সু। ভাল, যাতে তিনি লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন, এমন কাজ করার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি যে দিন আসবেন, সেদিন তুমি অনাহারে থেকো না। তিনি চলে গেলে তুমি আমার কাছে এসো।

সুধামুখীর সহৃদয়তা সন্দর্শনে হেমলতা মনে মনে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিল, কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। সুধামুখীও আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত মনে করিলেন না।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

প্রেম তিন প্রকার, রূপজ, গুণজ ও আত্মজ। রূপ দেখিয়া যে প্রণয়ে হৃদয় অভিভূত হয়, তাহাকে রূপজ প্রেম বলে। প্রথম দর্শনেই এই প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ প্রণয়ের গভীরতা আদৌ নাই। যাহাকে 'চোখের নেশা' বলে, ইহা তাহাই। রূপের মোহ যতক্ষণ, ততক্ষণ সে বিভোর থাকে। ভোগের সহিত এই মোহ ক্রমেই অপনীত হইয়া যায়। ইহা প্রেমের নিকৃষ্ট অবস্থা।

তাহার পর গুণজ প্রেম। ইহা গুণ দেখিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, কাজেই ইহার স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক। প্রথমে গুণ দর্শনে ইহা অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু নায়ক বা নায়িকার গুণাবলী ক্রমশঃ যতই প্রকাশ পাইতে থাকে, ইহারও ততই বিকাশ হইয়া থাকে। গুণে মুগ্ধ জীব সহসা গুণ ভুলিতে পারে না। রূপজ প্রেম যেরূপ সহসা অন্তর্হিত হইতে পারে, গুণজ প্রেম তদ্রূপ সহসা তিরোহিত হইতে পারে না। ইহা যেরূপ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়; গুণের অন্তর্দ্ধানে তদ্রূপ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

প্রেমের চরম পরিণতি আত্মজ প্রণয়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা রূপ-বর্ণ হইতে সমুদ্ভূত হয় না। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণ দেখে না, [illegible] বিচার করে না, আত্ম-ভাবেই বিভোর। যিনি আত্ম-প্রণয়ে

মত্ত, তিনি ভালবাসার প্রতিদান চাহেন না। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী। প্রণয়ী বা প্রণয়িনী ভাল বাসুন আর না বাসুন, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

হেমচন্দ্রের প্রতি গোলাপের প্রণয় প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত। আর হেমলতার অতলস্পর্শ, অপরিসীম ভালবাসা—অনন্তবিস্তারী সমুদ্রবৎ স্থির, গভীর ও তরঙ্গভঙ্গীহীন। বরং চন্দ্রের সহিত যদি খদ্যোতের তুলনা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও হেমলতার প্রণয়ের সহিত গোলাপের প্রণয়ের তুলনা হওয়া সম্ভবপর নহে।

দরিদ্রতাজনিত নানারূপ চিন্তায় হেমচন্দ্র উত্তরোত্তর যতই শ্রীহীন হইতে লাগিলেন, গোলাপের ভালবাসা কর্পূরের ন্যায় ততই লুপ্ত হইতে লাগিল। ভোগ বাসনার যতই পরিতৃপ্তি ঘটিতে লাগিল, হেমচন্দ্র গোলাপের ততই চক্ষুঃশূল হইতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র ইহাতে মর্ম্মপীড়িত হইতেন। কিন্তু তাঁহার মায়ার ঘোর তখনও কাটে নাই। তখনও তিনি গোলাপের প্রতি পূর্ণ অনুরক্ত ছিলেন। গোলাপের অসদ্ব্যবহারের অর্থ তিনি অন্যরূপে গ্রহণ করিতেন। গোলাপ যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে পারে, হেমচন্দ্রের ধারণাতেই তাহা আইসে নাই। গোলাপ অকারণে বিবাদ বিসংবাদ করিলে হেমচন্দ্র মর্ম্মক্লিষ্ট হইতেন বটে, কিন্তু ভাবিতেন, গোলাপ তাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় ভাবে বলিয়াই, বুঝি ঐরূপ আব্দার বা অভিমান করিয়া থাকে।

একে মনসা, তাহাতে আবার ধূনার গন্ধ! গোলাপের চিত্তবিকার যাহাতে সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ভবদাসীর চেষ্টার ত্রুটী হইল না। যাহাতে প্রতিনিয়ত উভয়ে বিবাদ হয়, ভবদাসীর তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণের অভাব ঘটে নাই।

ভবদাসীর মনের কথা উভয়ের কেহই জানিত না, কাজেই তাহাকে হিতৈষিণী অবিয়া গোলাপ তাহার সকল কথাই শুনিত।

একদিন ভবদাসী গোলাপের কর্ণে নানারূপ মন্ত্রণা দিতেছিল। এমন সময়ে হেমচন্দ্র বাটীতে আসিলেন। হেমচন্দ্রের পদশব্দ পাইয়া গোলাপ ভবদাসীকে বলিল, "আজ মিন্‌সেকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিব। লোকটা কি অকৃতজ্ঞ! আমার সঙ্গে চাতুরী করলে? আমি ওর জন্ত কি না ক'রেছি?"

ভবদাসী বলিল, "আমি একটু গা ঢাকা দিই, কিন্তু খুব সাবধান। কোন রকমে ওর কথায় ভুলে নরম হ'ও না।"

ভবদাসী চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র গোলাপ আহত ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "পুরুষেরা যে এমন নিমকহারাম হয় জানতুম না। তোমার জন্ত আমার কি হাল হ'য়েছে তা দেখ্‌ছো, আর তুমি কি না, কিসে তোমার স্ত্রী ভাল থাকবে, কিসে সে দুখানা গহনা পর্‌তে পাবে, তার চেষ্টা কর!

হে। কিসে গোলাপ? আমি স্ত্রীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করি না, আর আমি তার সুখান্বেষণে ব্যস্ত, তুমি একথা বল্লে?

গো। বল্লুম বৈ কি! আমি সব জান্‌তে পেরেছি। কাহার জন্ত আমার এ অবস্থা, তোমার জন্ত? কাহার জন্ত আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি—তোমার জন্ত। হেম! আমি জান্‌তুম, তুমি ধার্ম্মিক —তুমি প্রেমিক। এখন আমার সে ধারণা ঘুচে গিয়েছে, আমার ঘোর কেটে গিয়েছে। আমি তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছি।

হেম। গোলাপ! তুমি আমার জন্ত অনেক সাহয়াছ, অনেক সহিতেছ, তাহা জানি। কিন্তু আমি তোমার নিকট কোনরূপ

অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিই নাই। তুমি কেন বৃথা আমার উপর দোষারোপ করিতেছ ?

গো। দোষারোপ ? তুমি কি জান না, তুমি কি করিয়াছ। তুমি আমাকে নিরাভরণা করিয়াছ, কিন্তু তোমার স্ত্রীর গায়ে এখনও যথেষ্ট অলঙ্কার আছে। তোমার স্ত্রী অলঙ্কার পরবে, আর আমি যে নিরাভরণা থাক্‌বো, তা কখনই হ'বে না। হয় তুমি আজ তোমার স্ত্রীর গহনা নিয়ে এস, আর না হয় আমার বাটীতে এসো না।

হে। আমার স্ত্রীর গায়ে গহনা আছে তোমাকে কে বল্লে ? সে পরের বাটীতে দাস্যবৃত্তি কর্‌ছে, তার গায়ে গহনা ?

গো। তোমার নেকামী রেখে দাও। সেদিন রান্না হয় নি। আজ আবার রান্না হ'বে না। গহনা বা টাকা না আন্‌লে, আমি আজ জলস্পর্শ করবো না।

হে। গোলাপ! কাল থেকে আমি কিছু খাই নি। ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির হইয়াছি, এমন কি দাঁড়াইবার শক্তিও নাই। আমি নানাস্থানে চাকুরীর চেষ্টা করিতেছি, যে কয়দিন চাকুরী না জুটে, সেই কয়দিন খাইতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, বিবাদ বিসংবাদ করিও না।

গো। দেখ আমরা বেশ্যা, ছল চাতুরী অনেক জানি। তোমার মত অনেক লম্পট দেখেছি। কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আমার হাতে একটীও পয়সা নেই, কি ক'রে খাওয়া দাওয়া হ'বে ?

হে। এবেলা খাইতে দাও। আহারান্তে আমি অর্থের চেষ্টায় বাহির হইব।

গো। তুমি বড় বেইমান। আমি আর তোমার কথায় ভুলছি নি। ইচ্ছা হয়, টাকা আন, খাও দাও নতুবা উপবাস করে থাক।

হেমচন্দ্র গোলাপের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে গোলাপ একদিন তাহাকে শশধর অপেক্ষা সুন্দর বলিয়াছে, সেই গোলাপ আজি দুইটা অন্ন প্রদানে অসম্মত। হেমচন্দ্র তখন ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় অধীর হইয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোলাপের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন, আর বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় পুনরায় বহির্গত হইলেন।

হেমচন্দ্র চলিয়া যাইবার পর ভবদাসী বৈষ্ণবী পুনরাগত হইয়া বলিল' "ন্যাকা মিন্‌সে, ভাজামাছটা উল্‌টে খেতে জানেন না। পুরুষগুলো এত মিথ্যে কথাও জানে? ওমা! ওর কথা শুনে আমি হদ্দ হ'য়ে গেছি—বলে কি না ওর মাগের গায়ে গহনা নেই! তবু যদি ভবদাসী বৈষ্ণবী না দেখ্‌তো।"

গোলাপ বলিল, "আমি কি মিন্‌সেকে কম বলেছি। আমারও ভাই ধিক্কার জন্মে গেছে। আমাদের একদ্বার বন্ধ হ'বে, ত শতেক দ্বার খোলা থাকবে। তবে কি জান ভাই! ধর্ম্মের মুখ চেয়ে-ছিলাম। লোকটা আমার জন্য ঢের করেছে। আমার অসুখের সময় হাতে করে ময়লা ফেলেছে। কিন্তু আর সয় না।

ভ। তুমি মেয়ে বলেই, এতদিন সয়েছিলে, আমরা হ'লে এক দণ্ডও সইতুম না। কেন কষ্ট করতে যাব। কল্‌কেতা সহরে লোকের কি অভাব আছে?

গো। আচ্ছা মনোহর বাবু কোথায় আছেন জান কি?

ভ। জানি, তিনি দেশে গেছেন। দেখ, সেদিন একটা লোক—তা—ঐ কগে সে টিনের কারিকর—লোকটা বেশ, খুব ভাল মানুষ—তোমার কথা আমাকে বল্‌ছিলো।

গো। তা—যখন মিন্‌সে থাক্‌বে না—সে সময়ে ডেকে এ'ন না।

ভ। লোকটার টাকা আছে, বলে প্রথম মিলনে পঁচিশ টাকা দেবে। তবে সে তোমার বাবু থাকতে আসতে চায় না।

গো। এতদিনের মানুষ, হঠাৎ এক কথায় কি করে তাড়াই? প্রথমে গোপনে দেখাশুনা হ'ক, তার পর যা হয় করা যাবে।

ভ। বেশ! আজই ডেকে আন্‌বো?

গো। মিন্‌সে কখন আস্‌বে, তা ত জানিনে। লোকটা যখন আসবে, যদি সেই সময় মিন্‌সেও এসে পড়ে?

ভ। তুমি বড় কাঁচা মেয়ে। তুমি তাকে খাটের নীচে লুকিয়ে রেখো। তারপর ঝগড়া করে মিন্‌সেকে তাড়িয়ে দিয়ে লোকটাকে বা'র করে দেবে।

গো। বেশ পরামর্শ। তাই হবে, তুমি লোকটাকে ডেকে দিও।

গোলাপের কথা শুনিয়া ভবদাসীর আনন্দ হইল। ভবদাসী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আমার ভাগটি যেন মারা না যায়।" এই বলিয়া ভবদাসী প্রস্থান করিল।

—০—

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

-*০*-

হেমলতা ও হেমচন্দ্র।

পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীতে, রাত্রি নয়টার সময় এক কঙ্কালসার ব্যক্তি কলিকাতার রাজপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। সেই দুর্দান্ত শীতে তাঁহার গাত্রে একখানি উড়াণী ব্যতীত দ্বিতীয় গাত্র, বস্ত্র আর কিছুই ছিল না। একে শীর্ণকায়, তাহাতে আবার গাত্রবস্ত্রহীন বলিলেই হয়। তিনি শৈত্যাধিক্যে কম্পিত কলেবরে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। লোকটি পাদুকাহীন, পরিধানে মলিন বস্ত্র।

কমলকুমার বাবুর বাটির সন্নিধানে আসিয়া আগন্তুক দ্বারে মৃদু করাঘাত করিলেন। অনতিবিলম্বে হেমলতা দ্বারোদ্ঘাটন করিল। তিনি বাটীর মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন। দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল।

পাঠক বোধ হয় ইহাকে [illegible] ন আমাদিগের পরিচিত হেমচন্দ্র। তিনি দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন। আজ দুই দিবস তাঁহার আহার হয় নাই। কাজেই ক্ষুৎপিপাসায় অতীব কাতর হইয়াছেন। ইহার উপর শীতভোগজনিত ক্লেশে হেমচন্দ্র মৃতপ্রায় হইয়াছেন। মানসিক অবস্থাও তথৈবচ। তিনি গোলাপীকে পূর্ণ হৃদয়ে ভালবাসিয়াছিলেন। গোলাপও তাঁহাকে প্রথমে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে

লাঞ্ছনার একশেষ করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। ইহাতে তিনি যে মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। যে গোলাপের জন্য দেবীপ্রতিম হেমলতাকেও হৃদয় হইতে অপসৃত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যে গোলাপের জন্য তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়াছিলেন, সেই গোলাপ এখন তাহাকে তাচ্ছিল্য করে—সমস্ত দিবস অনাহারে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া দিনান্তে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেও একবার ভ্রমেও আহার করিবার জন্য অনুরোধ করে না, ক্রমাগতই অর্থের নিমিত্ত পীড়ন করিয়া থাকে। এতদপেক্ষা মর্ম্মক্লেশের আর অধিক কি কারণ হইতে পারে? হেমচন্দ্র ইহাতেও গোলাপকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। গোলাপের নিকট অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইলেও তিনি গোলাপের সংসর্গ অধিকতর স্পৃহণীয় বিবেচনা করিতেন—গোলাপের চিন্তাতেই দিবানিশি অভিভূত থাকিতেন।

হেমচন্দ্র কমলকুমার বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই পাছে অন্য কেহ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়—অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"বড় ক্ষুধা—প্রাণ যায়—কিছু আছে কি? আজ দুই দিন পেটে কিছু যায়নি। ক্ষুৎপিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে—কিছু খাবার থাকে ত সত্বর দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।" হেমচন্দ্রের জন্য প্রত্যহই হেমলতা নিজে না খাইয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিত। যামিনী যখন দ্বিপ্রহর হইত, যখন হেমচন্দ্রের আগমনের আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না, তখন সে আহার করিত। হেমচন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে হেমলতা স্বহস্তে তাঁহার পা ধুইয়া দিল, অতি যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতে বসাইল। হেমচন্দ্রের আহার সমাপনান্তে হেমলতা কাতরকণ্ঠে বলিল, "কাল যদি তোমার খাওয়াই না

হ'য়েছিল, তবে এ নাই কেন? তোমার জন্য প্রত্যহই ত অন্নাদি প্রস্তুত থাকে।"

হে। দেখ হেমলতা—প্রত্যহ আস্‌তে লজ্জা করে। আমি এখন সময়ে সময়ে বুঝতে পারি, আমি পশুত্বে উপনীত হয়েছি। এক একবার তাই তোমার কাছে আস্‌তে লজ্জিত হই। তুমি পরের বাড়ীতে দাস্যবৃত্তি করছো, এখানেও এসে তোমার উপর উৎপাত করিব, এটা ভাল নয় বলে কখন কখন মনে হয়। তাই উদর-জ্বালায় ছট্‌ফট করতে থাক্‌লেও তোমার নিকট আসি না। আর এঁরাই বা বল্‌বেন কি? পরের বাড়ীতে রোজ উৎপাত করলে তোমার চাকুরী যেতে পারে।

হেমলতা। না—এঁরা খুব সজ্জন। তুমি সে দিন এসেছিলে, সে কথা বাড়ীর গিন্নী জান্‌তে পেয়েছিলেন। তিনি রাগ করেন নাই, বরং তোমার আহারের জন্য বেশী করে রাঁধিতে বলে দিয়েছেন।

হে। তাঁকে আমার কথা কি তুমি নিজে বলেছিলে?

হেমলতা। না—তিনি স্বয়ং দেখেছিলেন।

হে। তুমি কি আমার জন্য বেশী করে প্রত্যহই রেঁধে থাক?

হেমলতা না—তিনি বল্লেও আমি কেন অধিক করে রাধবো? আমি যে কাজ করি, তার জন্য তাঁরা আমাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেন। আমি চাকরী করি, তাই সুধু আমারই থাবার কথা। সুতরাং আ[illegible] কেন আবার অ'র এক জনের অন্ন বেশী খরচ করাবো?

হে। তবে এ অন্ন ব্যঞ্জন কোথা থেকে দাও?

হেমলতা। সে কথার প্রয়োজন নাই। তুমি এখন একটু সুস্থ হ'য়েছ কি?

হে। হ'য়েছি। হেমলতা! আর একটা কথা বল্‌তে লজ্জা, হয়। আমার টাকার প্রয়োজন। তোমার কাছে কিছু আছে কি?

হেমলতা "আছে" বলিয়া একটী সিন্ধুকের চাবি খুলিল। হেমচন্দ্র দেখিলেন, সিন্ধুকের ভিতর কয়েকটী টাকা—দুই তিনখানি বস্ত্র এবং তাঁহার মাতার সেই নামাবলীখানি রহিয়াছে। হেমলতা টাকা কয়টী হেমচন্দ্রের পদপ্রান্তে স্থাপিত করিল। হেমচন্দ্র তাহার জননীর নামাবলী দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্ক হইলেন—চকিতের মধ্যে কত ভাবতরঙ্গ তাঁহার মনোমধ্যে প্রবাহিত হইল। তাহার পর টাকার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি সত্বর তাহা গ্রহণ করিলেন। হেমলতা ভাবিল, এতদিনে তাহার চাকুরী করা সার্থক হইল।

হেমলতা। তোমার গায়ের শাল কি হ'ল?

হে। বিক্রয় করেছি।

হেমলতা। পায়ে জুতা নাই, গায়ে কাপড় নাই, এতে যে অসুখ হ'বে?

হে। আমার অসুখ নাই। তুমি কি জান না, দরিদ্রের মৃত্যু ঘটে না।

হেমলতা। অমন কথা মুখে আনিও না। আমার পাপে, আমার দোষে, তোমার এই অবস্থা ঘটেছে। আমি মহাপাপিনী—নইলে এমন হইবে কেন?

হেমলতার কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া তথায় বসিয়া রহিলেন। তাহার পরে, হঠাৎ দ্রুতপদে বিনাবাক্যব্যয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। হেমলতা অবাক্ হইয়া রহিল। হেমচন্দ্রের সেই ভাব দেখিয়া হেমলতার মনে নানারূপ

আশঙ্কার উদয় হইল। হেমচন্দ্র কি উন্মাদগ্রস্ত হইলেন? নানা রূপ দুশ্চিন্তায় হেমলতার সে রাত্রিতে আদৌ নিদ্রা হইল না। হেমচন্দ্র কোথায় গেলেন? তিনি যদি প্রকৃতই বায়ুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি উদভ্রান্ত ভাবে পথে পথে ত ঘুরিয়া বেড়াইবেন? হেমচন্দ্র যদি নিদ্রা না যান, তাহা হইলে তাহার নিদ্রিত হওয়া উচিত কি? হেমলতা সমস্ত রাত্রি হেমচন্দ্রের চিন্তায় অতিবাহিত করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•০•—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা সেই রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহার স্ত্রীও দুহিতার শোকে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। কাজেই সংসারে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুকালে কন্যা পিতাকে মিনতিপূর্ব্বক বলিয়া গেল, তাহারই জন্য দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের ভিটা সেই গ্রাম হইতে উঠিয়াছে। একটি ব্রাহ্মণ পরিবার গ্রামত্যাগ করিল; সেই মহাপাপে অকালে তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। হেমচন্দ্র যাহাতে গ্রামে আসিয়া বাস করিতে পারে, তাহার উদরান্নের জন্য চিন্তা না থাকে, তাহার পিতা যেন তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। দুহিতার এই শেষ অনুরোধ—মৃত্যুকালের শেষ প্রার্থনা—চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইল। যে ভবন দাস দাসীর, আত্মীয় স্বজনের কোলাহলে সদাই প্রতিধ্বনিত হইত, পত্নী ও দুহিতার বিয়োগে ক্রমে তাহা নির্জ্জন হইল। সেই আনন্দ-প্রবাহ যেন কোথায় শুকাইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমস্ত সংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। যাঁহাকে আবালবৃদ্ধ বনিতা ভয় করিত, যাঁহার ক্রোধানলে পতিত হইলে কাহারও পরিত্রাণ থাকিত না, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক্ষণে নিরীহ নির্ব্বিরোধ ব্যক্তি হইলেন। তাঁহার প্রকৃতির এই

পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত হইল। এককথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাটির মানুষ হইয়া গেলেন।

মনোহর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "শৈলের কথা মনে আছেত দেওয়ানজী? আমি মহাপাপী, তাই গিন্নি ও শৈল আমাকে ত্যাগ করিয়া পলাইল। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইলাম," বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল।

দে। হুজুর আপনি বিজ্ঞ ও বিবেচক। আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। সংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নহে। চিরকালের জন্য কেহ থাকিতে আসে নাই। তাঁহারা অগ্রে গিয়াছেন, আমাদেরও তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে হইবে। মরণ নিশ্চয়—তবে অগ্রপশ্চাৎ ঘটিয়া থাকে।

ম। সব জানি—সব বুঝি। কিন্তু মন কি প্রবোধ মানে?

দে। যতদিন জগতে থাকিবেন, ততদিন ভুলিতে পারিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া অধীর হইলেই বা চলিবে কেন? কথায় বলে, "সম্বন্ধ জীবনাবধি।" যতদিন বাঁচিয়া আছি, এবং আত্মীয় স্বজন বাঁচিয়া আছে, ততদিনই সম্বন্ধ, ততদিনই "আমার আমার" করিয়া ব্যস্ত থাকি। কিন্তু মৃত্যুর পর আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধই থাকে না। হুজুর! আপনি জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আপনার আত্মীয় কুটুম্ব কোথায় ছিলেন, জগতের সঙ্গেই বা আপনার কি সম্বন্ধ ছিল? আপনার দেহ-ত্যাগের পরই বা ইহাদিগের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে? অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া আমরা প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া যাই, তাহাতেই এত কষ্টভোগ করিয়া থাকি।

ম। সত্যই বলিয়াছ। এই অহমিকাতেই মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, ধর্ম্মভাব বিলোপ করে। তাহা যদি না হইবে, আমার অপমান করিয়াছে বলিয়া—আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের সর্ব্বস্বাপহরণ করিব কেন? আজ তাহার পুত্রকে পথে পথে ভ্রমণ করাইব কেন? সেই মৃত দীনদয়াল ও তাহার ভার্য্যার, তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস এখনও বুঝি বহির্গত হইতেছে। তাহাতেই আমার সুখের সংসার ভস্মীভূত হইল! আমার ন্যায় ব্যক্তির ঔরষে শৈলের জন্ম হইয়াছিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সে এই পাপী নরাধমের নিকট থাকিবে কেন? গিন্নি আমাকে দীনদয়ালের অনিষ্ট করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন, কতদিন পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন—কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমি তাহাতে দৃক্‌পাতও করি নাই। যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফল ফলিয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। দেওয়ানজী! বলিতে পার কি, এই শোকাবেগ কিসে প্রশমিত হয়? বলিতে পার কি, আবার কি করিলে প্রমত্ত বারণের ন্যায় আমি সংসারে বিচরণ করিতে পারি—আমার মনের পূর্ব্বভাব আবার ফিরিয়া আসে?

দে। প্রভো! স্থির হউন। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। গত বিষয়ের শোচনা করা উচিত নহে। আপনি স্বয়ং শান্ত না হইলে আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, এমন কে আছে?

ম। শান্তি! সে ত চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আমার সাধের সংসার শ্মশান হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই কি শান্তিলাভ করিব? দেওয়ানজী! যাহা কিছু স্মৃতি-উদ্দীপক, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। লোকালয় ছাড়িতে হইবে—পর্ব্বতকন্দরে, বিজন

বিপিনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বুঝি গিরির ও শৈলের শোক ভুলিতে পারিব না। চিত্ত অবলম্বন শূন্য থাকিতে পারে না। একটা অবলম্বন চাই। এবার ভগবৎ চরণ অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা দুই নৌকায় পা রাখিলে চলিবে না? আমি গুরুদেবকে স্মরণ করিয়াছি। তিনি যেদিন আমাকে দীক্ষা দেন, সেই দিন বলিয়া গিয়াছিলেন, "বৎস! আমাকে স্মরণ না করিলে আমি আসিব না।" এতদিন তাঁহাকে স্মরণ করি নাই, করিবার প্রয়োজনও ঘটে নাই। এক্ষণে স্মরণ করিবার সময় সমাগত। আমি গিরিকে ও শৈলকে ভুলিতে পারি, তাঁহার নিকট এমন উপদেশ চাহি।

দে। ভালই করিয়াছেন। এ বিপদে তিনি ব্যতীত আপনাকে অন্য কেহ সান্ত্বনা দিতে পারিবে না।

ম। সান্ত্বনার জন্য নহে। দেওয়ানজী! তুমি কি মনে কর, যে শোকাগ্নি হৃদয় মধ্যে দিবানিশি জ্বলিতেছে, তাহা কখন নির্ব্বাপিত হইবে—না হইতে পারে? স্মৃতিলোপ না হইলে ইহা যাইবে না সপ্ত সাগরের জল ঢালিয়া দিলেও আমার হৃদয়স্থিত রাবণের চিতা-বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হুতাশন নিবিবে না।

দে। তা জানি প্রভু; যতদিন গুরুদেব না আইসেন, ততদিন ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনার অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বিশৃঙ্খল হইবার উপক্রম হইয়াছে। লোকজন সতত নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ থাকে। বিষয়কর্ম্ম অচল হইবার মতন হইয়াছে। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও সুনিয়মে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিতে পারিতেছি না। কর্ণধার বিহনে তরণীর যে অবস্থা হয়, আপনার শোকে তদ্রূপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ম। বিষয়কর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর। আমাকে আর বিষয় কর্ম্মের কথা বলিও না। বিষয় কর্ম্ম? কাহার বিষয় কে দেখে—কে করে? দেওয়ানজী! আমি ত শৈলকে বাঁচাইবার জন্য কিছুরই ক্রটী করি নাই, তবু সে বাঁচিল না কেন? আমার সংসার যাহাতে অটুট থাকে, তৎপ্রতি আমার যত্নের ক্রটি ত হয় নাই, তবু সে সংসার অটুট রহিল না কেন? তবে তত্ত্বাবধানের মূল্য কি আছে? আমি সংসারের কীট—নরাধম পশু। আমার দ্বারা সংসার বিনষ্ট হইবে ছাড়া গড়িবে না। আমি তাই সংসার ছাড়িব। বুঝিয়াছি, আমি ভাঙ্গিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, গঠন করিতে নহে। গুরুদেব! কোথায় তুমি! আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। শ্রীচরণে আশ্রয় দাও।

দে। হুজুর! শান্ত হউন, অধীর হইবেন না। এ জগতে ভাঙ্গা গড়া ভগবানের হাত। আপনার কোন কর্ম্মেই কৃতিত্ব নাই।

ম। দেওয়ানজী! গুরুদেব আসিবার পরই আমি কলিকাতায় যাইব। তথা হইতে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইব, এইরূপ মানস করিয়াছি। গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিব না। যাহা হউক, তুমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিও। আমার মনে হয়, গুরুদেব এ বিষয়ে অমত করিবেন না।

দেওয়ানজী প্রস্থান করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তথায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

———০———

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-•-•-

অনুতাপের সূচনা।

হেমচন্দ্র টাকা লইয়া একেবারে গোলাপের বাড়ীতে আসিল। দ্বারদেশ রুদ্ধ ছিল, করাঘাত করিল। এক, দুই, তিন, চারি—দ্বারোদ্ঘাটন আর হইল না। একি? এমন ত কখন হয় না। মৃদু করাঘাতে যে দ্বার উন্মোচিত হইয়া থাকে, আজি বারংবার করাঘাতেও তাহা উদ্ঘাটিত হইতেছে না কেন? তবে কি গোলাপ গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়াছে? বাড়ীতে ত অন্য লোক আছে, তাহারাও কি নিদ্রিত? হেমচন্দ্র গোলাপের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। প্রবল শীতের তাড়নে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিহি খাব্‌জা স্বরে, যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় গোলাপ বাটীর ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কে গা।" গোলাপের স্বর শুনিয়া হেমচন্দ্র হাতে স্বর্গ পাইলেন, বলিলেন, "আমি—হেম। শীঘ্র দরজা খোল, শীতে প্রাণ যায়।"

"ভাল জ্বালা, রাত্রিতে ঘুমাবারও যো নাই?" বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে গোলাপ দ্বারোন্মোচন করিল। হেমকে দেখিয়াই বলিল "শীতে তোমার প্রাণ যায় ত আমি কি করবো? এত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার জন্য কে ব'সে থাকবে?" সুরার মহিমায় গোলাপের চক্ষের ভাব তখন অন্যরূপ হইয়াছিল—কথা স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট ছিল

না; বেশও তথৈবচ। গোলাপকে তদবস্থায় দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। গোলাপ তাহার সহিতই সুরা পান করিয়া থাকে, কদাচ অন্যের সহিত, তাহার অনুপস্থিতিকালে, মদ্যপান করে না: আজ একি? অদ্য ত তিনি, সুরাসেবন করেন নাই। তবে গোলাপ কাহার সহিত মদ্যপান করিল? প্রথম সাক্ষাতেই সে কলহের সূত্রপাত করিল কেন? হেমচন্দ্র ইহার কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিল না। গোলাপকে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপ তাহাতে বাধা দিল।

হে। আমার দোষ হইয়াছে। এত রাত্রি পর্য্যন্ত তুমি যে আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে তাহা আমি ভাবি নাই। গোলাপ, ঘরে যাই চল।

গো। ঘরে যাইবার যো নাই। আমার গঙ্গাজলের এক পরিচিত বন্ধু এসেছেন, গঙ্গাজলের বাবু পাছে রাগ করেন বলে, বন্ধুকে আমার ঘরে রেখে গেছে।

হে। (সবিস্ময়ে) ইহার অর্থ কি? আমি আসিব ত তুমি জান। সুতরাং অপর লোককে কিরূপে তুমি গৃহে স্থান দিলে?

গো। আমার ত লোক নহে। বন্ধু বান্ধবের উপরোধে সব করতে হয়।

হে। তুমি কোথায় ছিলে?

গো। ঘরে।

হে। ঐ পুরুষটার সহিত?

গোলাপ নীরব রহিল। হেমচন্দ্রের আর বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। যদি সেই সময়ে তথায় সহসা অশনিসম্পাত হইত, তাহা হইলেও হেমচন্দ্র বোধ হয়—তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইতেন

না। তিনি সমস্ত শূন্যাকার দেখিতে লাগিলেন। দিগন্তবিস্তারী আকাশের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন সেই তারকামণ্ডলীপরিবেষ্টিত শশধর—সেই সুনীল বিমান—অথচ কি যেন একটা মহাশূন্যতায় উহা পরিব্যাপ্ত। নিম্নে চাহিলেন—সেই ঘর, সেই গোলাপ, সেই পৃথিবী—সকই সমান আছে, অথচ একটা মহান অভাব যেন চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছে। সব আছে—অথচ কি যেন নাই। বুকের ভিতর রক্তস্রোত প্রবল বেগে চলিতে লাগিল—হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি যেন শুনা যাইতে লাগিল—যেন একটা মহা হুতাশ আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে শূন্যময় করিয়া তুলিল। হেমচন্দ্র একবার গোলাপের মুখের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন প্রথম দর্শনে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সে গোলাপ—এ গোলাপ নহে। স্বর্গের বিদ্যাধরী ও নরকের প্রেতিনীতে যে পার্থক্য—এতদুভয়ে সেই পার্থক্য বিরাজ করিতেছে। হেমচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—গোলাপকে টানিয়া লইয়া প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দেখিলেন—পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় একটা অপরিচিত ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে। সে সময়ে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। গোলাপের প্রকোষ্ঠ তাহার বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তখন হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছিল। সেভাব দেখিয়া গোলাপের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—সে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল।

হেমচন্দ্রের চক্ষে দুই ফোঁটা জল আসিল—বড় বড় মুক্তার ন্যায় তাহার গণ্ড বহিয়া গোলাপের মাথায় পড়িল। গোলাপ বুঝি এই তপ্তাশ্রুতে পবিত্রীকৃত হইল। হেমচন্দ্র বলিল—"গোলাপ! কোন্ অপরাধে আমার এই দণ্ড?" আর কথা সরিল না তিনি তথায় বসিয়া পড়িলেন। হেমচন্দ্র সে সময়ে গোলাপের হস্ত ছাড়িয়া

দিয়াছিলেন—সে সুযোগ বুঝিয়া এক লম্ফে গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল।

হেমচন্দ্র কিছুই বলিলেন না। গোলাপকে দ্বার রুদ্ধ করিতে দেখিয়া একবার বিজাতীয় ক্রোধের উদ্রেক হইল। ভাবিলেন, গোলাপকে ও ঐ পুরুষটাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করাইবেন। পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয় অধিকার করিল। গোলাপের উপর অত্যাচার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। তিনি নিষ্ঠুর, নৃশংস হইতে পারেন—কিন্তু তা বলিয়া কি গোলাপের গায়ে হাত তুলিতে পারেন? তিনি নরাধম হইতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া কি গোলাপের অনিষ্ট-চিন্তা করিতে পারেন? কাজেই গোলাপকে দণ্ড দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য লোকে তথায় উপস্থিত হইল। কেহ বা তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিল, গোলাপের কার্য্যে দোষারোপ করিল—কেহ বা হেমচন্দ্রের নম্র প্রকৃতির দোষ দিল। হেমচন্দ্রের কর্ণে এই সকল দোষগুণ বিচারের কথা প্রবেশ করিল না। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে উঠিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"গোলাপ—চলিলাম—তুমি সুখী হও।" তাহার পর তিনি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে গোলাপের বাটী ত্যাগ করিলেন। যে কয়টী টাকা তিনি হেমলতার নিকট হইতে আনিয়াছিলেন, তাহা সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

—০—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*০*—

হেমচন্দ্র কি করিলেন।

হেমচন্দ্র বরাবর জাহ্নবী তীরাভিমুখে গমন করিলেন। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন উন্মত্তের ন্যায় তিনি নিমতলার ঘাটে উপনীত হইলেন। সম্মুখে কুলুকুলু রবে, ক্ষুদ্র বীচিমালা বক্ষে ধারণ করিয়া, পূণ্যতোয়া ভাগিরথী সাগরাভিমুখে প্রধাবিতা। নদীবক্ষে অনন্ত তরণীশ্রেণী—কেহ বা ক্ষুদ্রাবয়ব, কেহ বা মধ্যমাকৃতি, কেহ বা বিপুলকায়। অর্ণবযানগুলির অভ্রভেদী মাস্তুল হইতে পতাকারাজি পৎ পৎ রবে বায়ুভরে উড্ডীন হইতেছে। পোতস্থিত আলোকমালায় ভাগিরথী বক্ষ পরিশোভিত।

পার্শ্বে মহাশ্মশান। চিতাবহ্নি হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া গগন স্পর্শ করিতে ধাবিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে শবদাহজনিত চটপট শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। কেহ বা শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে দিগন্ত পূর্ণ করিতেছেন।

পশ্চাতে অগণিত সৌধ সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান। ইহারা যেন শ্মশানকে টিটকারী দিবার জন্য দম্ভভরে আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেছে। লোক-কোলাহল প্রশমিত হইলেও নগর এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয় নাই।

নিমতলা ঘাট অতি মনোরম স্থান। এখানে উত্থান পতন, শান্তি বিগ্রহ সমুজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। বিলাস-বৈরাগ্য, ভক্তি-ভয়, কোমল-কাঠিন্য, অমৃত-গরল একত্র মিশিয়াছে। এমন সন্ধিস্থল কোথাও দেখি নাই। গঙ্গার সোপানাবলীর উপর বসিলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের হাসি ও ভ্রুভঙ্গি যুগপৎ মনে উদিত হইয়া থাকে।

হেমচন্দ্র উদ্বেলিত হৃদয়ে এইখানে আসিয়া বসিলেন। সলিলকণা-সম্পৃক্ত শীতল বায়ু তাঁহার কপোলদেশ চুম্বন করিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, দিক্‌হারা পান্থের ন্যায় বসিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সে সময়ের চিন্তা কোন বিষয়-বিশেষে সংবদ্ধ ছিল না—কত বিষয়েই ধাবিত হইতে লাগিল—আবার ক্ষণপরে তাহা বিলুপ্ত হইল। তাঁহার হৃদয়ে অসংলগ্ন অসম্বন্ধ চিন্তা-স্রোতে নানা তরঙ্গভঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। বাল্যের সুখস্মৃতি, যৌবনের দুর্দ্দমণীয় দুষ্প্রবৃত্তি, সকল কথাই একে একে মনে হইতে লাগিল। যেদিন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, যে দিন কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক ইহধাম ত্যাগ করেন, যে দিন হেমলতার প্রতি অনুরাগের প্রথম সঞ্চার হয়, তাহার পর যে দিন বিবাহ হয়, সকলই মনে হইল। মনে হইল, তিনি কি ছিলেন, কি হইয়াছেন। কেন এমন হইল, কি করিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা পাওয়া যায়? আর কি সেদিন ফিরিয়া আসিবে না? যাহা যায়, তাহা কি ফিরে না? হায় গোলাপ! কেন এ শেলাঘাত করিলে? একজন কুটী কুড়াইয়া কুটীর বাঁধে—আর একজন তাহা ভাঙ্গিয়া নির্ম্মমতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাহার জন্য গৃহ বাঁধিলাম, যাহার জন্য খেলার ঘর সাজাইলাম, সে-ই পদাঘাতে চূর্ণ করিতে মমতা করিল না! হায়! কেন এমন হয়?

শুনিয়াছি, মানুষ দেব-প্রতিমূর্ত্তি—দেবাংশে উদ্ভূত। তবে যাহা বনের পশু করিতে পারে না—যাহা করিতে মায়া প্রকাশ করে, মানুষ অবাধে তাহা করে কি প্রকারে? যে গড়ে, সেই ভাঙে, এমনটা কেন হয়? কোন্ বিধির বিধানে ইহা সমাহিত হইয়া থাকে, কেহ কি বলিতে পার? যদি পার বলিয়া দাও—দন্তে তৃণ করিয়া—গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, আমার বেলায় তিনি যেন ভাঙিবার নিয়ম লোপ করিয়া দেন—যেন সুধু সৃষ্টি করিবার নিয়মই বলবৎ রাখেন। আমার ভাঙা প্রাণ জোড়া লাগুক, আবার সোহাগ ভরে—আকুল ভাবে গোলাপের সহিত চোখে চোখে, প্রাণে প্রাণে কথা কহিতে পারি। তাহা কি আর হইবে?

হেমচন্দ্র আবার ভাবিলেন, তিনি নিতান্ত বাতুল, তাহা না হইলে পাষাণ হইতে অমৃত ধারা বর্ষণের আশা করিয়েছেন কেন? যাহাতে হৃদয়ে প্রণয়ের উৎস ছুটে, প্রেমে নন্দনকাননের শোভা জগতে আনয়ন করে তিনি হাতে পাইয়াও পায়ে ঠেলিবেন কেন? যে স্বর্গের দেবী তাহাকে তিনি ভুলিলেন কেন? তাহার সহিত গোলাপের তুলনা। সমুদ্রের সহিত গোস্পদের, চন্দ্রের সহিত খদ্যোতের, পর্ব্বতের সহিত বল্মীকের, পারিজাতের সহিত কিংশুকের যে সম্বন্ধ, হেমলতার সহিত গোলাপের তদ্রূপ সম্বন্ধ। উভয়ের মধ্যে তুলনাই হয় না—একজন ত্রিদিবের দেবী, অন্যে নরকের পিশাচী। হেমচন্দ্রের হৃদয় শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অনুতাপ-বিষে বিদগ্ধ হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এ মর্ম্মজ্বালা কি কখন নিবারিত হইবে?

হেমলতার সকল গুণের কথা একে একে হেমচন্দ্রের হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে সেই সরলা বালিকা যখন বাপীতটে

পুষ্পবীথিকায় বসিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রাজা রাণীর গল্প শুনিত; প্রবল বায়ুতাড়নে অলকাদাম তাহার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া কৃষ্ণ মেঘরাজির মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় তাহার মুখের শোভা বর্দ্ধন করিত, বালিকা কেশপাশ গুছাইয়া পৃষ্ঠদেশে ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইত, তখন হেমচন্দ্র কত সুখ সম্ভোগ করিতেন। -

তাহার পর—বিবাহান্তে সেই ব্রীড়াবনত পদ্মমুখখানি; সেই সলজ্জ ভাব, সেই স্ফুরণোন্মুখ যৌবনপ্রভা—সেই অপরূপ রূপ-মাধুরী—সকলই হেমচন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল।

সুধুই কি রূপ? হেমলতার গুণের কি সীমা আছে? তাহার ভক্তি অনন্ত, ভালবাসা অপরিমেয়। কেবল তিনি নহেন,—হেমলতার প্রেম-প্রীতিতে সমগ্র জগৎ মুগ্ধ। তিনি হেমলতার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি সে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাঁহার প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা প্রদর্শনে ক্রটী করে নাই। কেবল তাহাই নহে—তাহার জননীর নামাবলীখানি—যাহার অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন—সে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছে। হেমলতা তাহার শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে দেখে নাই—অথচ তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি অতুলনীয়।

হেমলতা এবং তাঁহার মাতার কথা একে একে হেমচন্দ্রের চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। ক্রমেই জননীর মৃত্যুকালীন আদেশ হেমচন্দ্রের মনে পড়িল। তিনি সদাই ধর্ম্মরত থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন, হেমচন্দ্র সেই উপদেশ অবহেলা করিয়া স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। জননীর নিকট আপনাকে মহা অপরাধী ভাবিয়া হেমচন্দ্রের অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্র যতই জননীর কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধীর হইলেন।

ক্রমে তাঁহার জ্ঞান-বিলুপ্তপ্রায় হইল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। সেই, নীরব নিশীথে—সেই লোকশূন্য নদী সৈকতে বসিয়া হেমচন্দ্র অনেক ভাবিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

যাও হেমচন্দ্র! যাও সেই পূণ্য স্থানে—যেখানে শোকতাপ নাই, জ্বালা যন্ত্রণা নাই, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা নাই। যাও সেই অমরধামে—যেখানে তোমার ন্যায় নরাধমেরও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে—সতীর শোকাশ্রুসিক্ত হইয়া তোমার দুরপনেয় কলঙ্কেরও মোচন হইতে পারে। সেই অমৃতধামে যাইলে পিশাচ দেবতা হয়, পশুত্ব ঘুচিয়া যায়—চিত্ত নির্ম্মল হয়।

কিন্তু এক কথা। তুমি একবার ভাবিলে না, তোমার অবর্ত্তমানে হেমলতার দশা কি হইবে? ভাবিলে না, তোমার বিয়োগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেই সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি, পবিত্রতার আধার, সদ্‌গুণাবলীর আদর্শস্থানীয়া কি মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা পাইবে? সে কি বাঁচিবে?

অথবা তোমার দোষ কি? নিয়তির খণ্ডন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত ব্যাপার। যাহা হইবার, তাহা হইবে। হেমলতার অদৃষ্টে যদি বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ থাকে, তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারিবে?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—•✱:o:✱•—

অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন।

গুরুর নিকট কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনোহর চক্রবর্ত্তী নৌকাযোগে কলিকাতায় আগমন করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত দেওয়ান রত্নাকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রকৃতি এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার সে ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাব নাই—সে তর্জ্জন গর্জ্জন নাই। ভীষণ ঝটিকার সময় দুকুলপ্লাবী নদীর ভীম ভৈরব গর্জ্জন—উত্তালতরঙ্গবিক্ষোভ, খরস্রোত প্রভৃতি যেরূপ ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে—আবার বাত্যা অন্তে নদীর ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি তদ্রূপ চিত্ত পুলকিত করিয়া থাকে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও এখনকার প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। এখন তাঁহার হৃদয় যেন আবেগশূন্য—বদনমণ্ডলে অধীরতার চিহ্নমাত্রও নাই। গুরুদেব তাহার কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন! তিনি তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছেন। নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত ভাবে জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় তিনি কার্য্য করিয়া যাইতেছেন।

যে সময়ে মনোহর চক্রবর্ত্তীর নৌকা নিমতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল, তাহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই হেমচন্দ্র জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। গঙ্গাবক্ষে গুরুভার পতনজনিত শব্দ নৌকাবাহীদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। সুদক্ষ মাঝী সেই শব্দ শুনিয়া বলিয়া উঠিল "জলে মানুষ পড়েছে—মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডুবে যাবে।" চক্রবর্

মহাশয় আদেশ করিলেন—যে লোকটাকে তুলিতে পারিবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব।" নিমেষের মধ্যে দুই তিন জন মাঝি জলে পড়িল। নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। অনতিবিলম্বে মাঝীরা জল হইতে জনৈক অর্দ্ধমৃত ব্যক্তিকে ঘাটে তুলিল। জলমগ্ন ব্যক্তির তখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। কাজেই অল্প চেষ্টাতেই তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন তাঁহাকে লইয়া বাসার অভিমুখে গমন করিলেন।

গুরুদেব বলিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতই মনোহর চক্রবর্ত্তীর পাপে তাঁহার সংসার বিনষ্ট হইল, অকালে তাঁহার দারা দুহিতা প্রাণ হারাইল। উহাতেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। যাহাতে দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত সম্পত্তি তদীয় পুত্র প্রাপ্ত হন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তাহা করিতে হইবে।

কেবল ইহাই নহে—গ্রামে একটী অন্নসত্র স্থাপন করিতে হইবে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জমিদারীতে প্রজাবর্গের উন্নতি ও হিতকল্পে ঔষধালয় ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দিতে হইবে। এই সকল কার্য্য করিতে যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তিলমাত্র কুণ্ঠা বা অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে উহা পণ্ড হইবে। যদি স্বেচ্ছায়, আনন্দ সহকারে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সার্থক হইবে। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে নৈমিষারণ্যে গুরুর নিকট যাইতে হইবে। তাহার পর যথাকর্ত্তব্য গুরুদেব পুনরায় অবধারণ করিয়া দিবেন।

গুরুর আজ্ঞা পালনার্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতায় আগমন করিলেন। তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য, দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রকে

তাহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাসায় আসিয়া দেখিলেন, তিনি যাহার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনিই আত্মহত্যা করণোদ্দেশ্যে গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং হেমচন্দ্রের উদ্ধার হওয়ায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে চক্রবর্ত্তী মহাশয় হেমচন্দ্রকে বলিলেন "তুমি কি আমাকে চিনিতে পার?"

হে। পারিবে কি! আপনি দুইবার আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আপনি জীবনদাতা—পরিত্রাতা।

ম। আমি তোমার মহাশত্রু। শুধু তোমার কেন, তোমার পিতৃশত্রু।

হে। সে কিরূপ?

ম। শুন হেমচন্দ্র! আমার নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী। আমারই অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, আমারই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়া তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব হৃতসর্ব্বস্ব হন। তাহার পর ভগ্নহৃদয়ে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি আমাকে সমাজের নিকট, জনসাধারণের নিকট নিকৃষ্ট কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় আমার ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। তোমার পিতা ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও আমার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল না। তোমার মাতাকে আমি গৃহ হইতে বিতাড়িতা করিলাম, তাঁহার পর তাহার মৃত্যু হইল। তখনও তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, কেবল জেদের বশবর্ত্তী হইয়া আমি উহাতে ব্রতী হই। কিন্তু আমার সে চেষ্টাও বিফল হয়। ভগবানের যাহা অভিপ্রেত নহে, তাহা সুসম্পন্ন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

মূঢ় আমরা—এ সামান্য কথাটাও বুঝিতে পারি না। আমাদিগের প্রাত্যহিক জীবনে এরূপ শত শত ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহা একটু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, মানুষ কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে—কোন বিষয়েই আমাদিগের কৃতিত্ব নাই। জীব নিতান্ত ভ্রমান্ধ না হইলে "আমি করিতেছি, আমি বুদ্ধিমান," প্রভৃতি অহমিকা ভাবে বিভোর হয় না। সে যাহা হউক, তুমি অন্যের অলক্ষ্যে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলে। তোমার অনুসন্ধানে আমি অনেক লোক নিযুক্ত করিলাম, কিন্তু কেহই তোমার কোন সমাচার দিতে পারিল না। অবশেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষণে হতাশ হইয়া আমি আমার কন্যার বিবাহ দিই। ইহাতে আমার প্রতিহিংসানল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আমি অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। তোমার অনুসন্ধানার্থ আমি স্বয়ং বহির্গত হইলাম। আমি কলিকাতায় আসিয়া তোমার সাক্ষাৎ পাই। তুমি যে দিবস গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাও, সে দিনের কথা তোমার মনে আছে কি?

হে। আমিও সে দিবস আপনাকে ঠিক চিনিতে না পারিলেও যেন চেনা লোক বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। একবার আপনার কথা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আপনি কেন কলিকাতায় আসিবেন এবং কলিকাতায় আসিলেও কেন ঐরূপ গাড়ীঘোড়া চড়িবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। কাজেই উহা আমারই ভ্রম বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ম। তাহার পর শুন। তোমার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আমার ক্রোধ তোমার স্ত্রীর উপর পতিত হইল। তোমাকে সুরামত্ত, বেশ্যাসক্ত করিয়া—পথের ভিখারী করিয়া—সমাজের আবর্জ্জনায় পরিণত করিব, আর তোমার ভার্য্যাকে সাধারণ গণিকাশ্রেণীভুক্ত করিয়া

বৈরনির্য্যাতন করিব, স্থির করিলাম। ইহার জন্ত গোলাপকে এবং ভবদাসী বৈষ্ণবীকে নিযুক্ত করি। ভবদাসীকে তুমি চেন ত?

হেমচন্দ্র যখন এই কথা শুনিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। মানুষ যে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইলে, হিংস্রক পশু অপেক্ষাও ভয়ানক হইতে পারে, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। এখন বুঝিলেন, সংসার কি ভয়ানক স্থান—ইহা শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য অপেক্ষাও ভীষণতর। যে ভবদাসীকে তিনি হিতৈষিণী ভাবিতেন, সে কি ভয়ানক পাপ কার্য্যে নিযুক্তা? হেমলতাকে পাপজালে জড়িত করিতে সে কি এখনও সচেষ্ট? সে কি হেমলতার সর্ব্বনাশ করিতে পারিয়াছে?—আর তাঁহার ভাবিবার শক্তি রহিল না। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিলেন। মনোহর চক্রবর্ত্তী তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

হে। ছাড়িয়া দিন, ছাড়িয়া দিন। আমার আর সর্ব্বনাশ করিবেন না। আমার প্রাণের হেমলতা কুপথগামিনী হইয়াছে কি না—একবার দেখিয়া আসি। আর সেই পিশাচী ভবদাসীকে পাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করি। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি ভবদাসীকে চিনি কি না? তাহার বাহ্যিক মূর্ত্তি চিনি, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছন্ন সয়তানী মূর্ত্তি এত দিবস চিনিতাম না। আপনার মুখে সকল কথা শুনিয়া আমার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মিলিত হইয়াছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি দেখিয়া আসি, সর্ব্বনাশী আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "স্থির হও হেমচন্দ্র! আমাকে আর পূর্ব্ববৎ নৃশংস পশু ভাবিও না। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তাহা না হইলে তোমার নিকট আমার পাপ কীর্ত্তন

করিতাম না। আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হেমলতা সতীসাধ্বী, তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা ভবদাসীর নাই।

হে। আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?

ম। জানি বলিয়াই বলিতেছি। আমি মিথ্যা কথা বলিব না। কাহার জন্য, কিসের জন্য মিথ্যা বলিব? আমার আর কে আছে? সংসারের যাহারা বন্ধন ছিল—তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমার বড় আদরের কন্যা শৈলবালা—যাহার সহিত তোমার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম—সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার গর্ভধারিণীও কন্যাশোকে অধীর হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার সোণার সংসার শ্মশান হইয়াছে—আমার সাধের নন্দনকানন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। হেমচন্দ্র—হেমচন্দ্র—আমি এখন ক্ষমার ভিখারী—দয়ার পাত্র। দয়া করিবে কি?—এই দুর্জ্জনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবে কি?

হে। আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমি লজ্জিত হই। হেমলতা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন, সত্বর বলুন।

ম। হেমলতাকে ধর্ম্মভ্রষ্টা করিবার জন্য আমি ভবদাসীকে নিয়োজিত করি। অর্থ বল, অলঙ্কার বল, কিছুরই প্রলোভন দেখাইতে ত্রুটী করি নাই। ভবদাসীও প্রথমে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন হেমলতার আহার হয় নাই—এক গণ্ডূষ জলও পেটে যায় নাই—অথচ সে অবজ্ঞা ও ঘৃণার সহিত অন্য কর্ত্তৃক অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

হেমচন্দ্র এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ম। শুন হেমচন্দ্র! ইহা কাঁদিবার সময় নহে। ক্রমে পুণ্যের নিকট পাপের পরাজয় ঘটিল, পতিব্রতার নিকট কুলটা ভবদাসীর কৌশলজাল ছিন্ন হইল। ভবদাসীর চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আমি সমস্ত সংবাদ রাখিয়াছি—ভবদাসী এখন আর সে ভবদাসী নহে—এখন সে পবিত্র হইয়াছে—দশের উপকার করিতে শিখিয়াছে।

হে। আপনি আমাদিগের যেরূপই অপকার করুন না কেন, দুইবার আমার জীবন রক্ষা করিয়া আপনার সমস্ত দোষ খণ্ডন করিয়াছেন।

ম। না হেমচন্দ্র—তাহা হয় নাই। আমার পাপের অন্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তুমি ক্ষমা না করিলে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে না। তোমার পৈতৃক সম্পত্তি আমি প্রত্যর্পণ করিব। তুমি দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ কর, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

হেমচন্দ্র নীরব রহিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আর এক কার্য্য করিতে হইবে। হেমলতাকে এখানে আনিতে হইবে। আমি সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। মায়ের দর্শনে আমার পাপরাশি তৃণসম দগ্ধ হইয়া যাইবে। হেমচন্দ্র! আমার এই অনুরোধটী রাখিবে কি?

হে। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

ম। তবে যাও। যদি ভগবান তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। তুমি কমলকুমার বাবুর বাটীতে যাইয়া হেমলতাকে লইয়া আইস।

হে। আপনি যখন বলিতেছেন, তখন হেমলতাকে আমি আনিতে যাইব। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার একবার কমলকুমারের এবং রত্নেশ্বর বাবুর সহিত কথা কহিলে ভাল হয় নাকি?

ম। উত্তম পরামর্শ। আমি সকলের নিকট যাইব। সকল কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিতে হইবে। তুমি আমার সহিত চল।

মনোহর বাবুর প্রস্তাবে হেমচন্দ্র অনুমোদন করিলেন।

পরিশিষ্ট

জলে মলিনতা বিধৌত হয়। তাই বুঝি গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া হেমচন্দ্রের মলিনতা বিধৌত হইয়াছে। যে মনোহর চক্রবর্ত্তী তাঁহার পিতৃশত্রু, যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল চরিত্রবল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে, যে মনোহর চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভার্য্যাকে পর্য্যন্ত স্বৈরিণী সাজাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, সেই মনোহর চক্রবর্ত্তীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলেন। জমিদার মহাশয়ের অনুরোধ অনুসারে ভবদাসী বৈষ্ণবীর সমভিব্যাহারে তিনি হেমলতাকে জমিদার মহাশয়ের বাসাতে আনিলেন।

মনোহর চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আজি মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। কেবল যে হেমচন্দ্র ও হেমলতা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা নহে, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বরী ঠাকুরাণী, কমলকুমার ও সুধামুখীও আসিয়াছেন। মনোহর চক্রবর্ত্তী সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে উৎসর্গ করিয়া, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনেরও সংস্থান না রাখিয়া, তীর্থে গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফলে দানদয়াল মুখোপাধ্যায়ের ভার্য্যা ভিখারিণী হইয়াছিলেন, তিনি যদি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল কিরূপে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হেমচন্দ্রকে তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন স্বগ্রামে শৈলবালার নামে এক অন্নসত্র

[illegible]লেন। এই অন্নসত্রের তত্ত্বাবধানের ভার হেমচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। এতদ্ব্যতীত, হেমলতার নামে স্বতন্ত্র সম্পত্তি দান করিলেন।

তিনি ভবদাসী বৈষ্ণবীর কথাও বিস্মৃত হন নাই। ভবদাসী যদি তাঁহার প্রস্তাবানুসারে হেমলতাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত, তাহা হইলে হেমলতার পরিণাম হয় ত অন্যরূপ হইত। সে কথা স্মরণেও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরীর শিহরিয়া উঠিল। ভবদাসী যে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি তাঁহাকেও প্রচুর [illegible] দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভবদাসী তাহা গ্রহণ করিল [illegible] জীবনের শেষ কয় দিবস বৃন্দাবনে বাস করিবে বলিল।

রাধাবাজারে দোকান করিয়া রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ও হেমলতার ভাগ্যোদয়ে তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনিও সস্ত্রীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্বর্ণপুরে বাস করিবেন বলিলেন।

আর সুধামুখী? তিনি যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। হেমলতাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়া দুঃখ, আর হেমলতার সুখোদয়ে সুখ, তাঁহাকে বিহ্বল করিল। হেমলতার হাত ধরিয়া সুধামুখী অনেক কথা [illegible]লিলেন। কখন হাসিয়া অধীর হইলেন, কখন বা কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইলেন।

সুধামুখীকে ছাড়িতেও হেমলতার অল্প দুঃখ হয় নাই। সে [illegible]পুত্রকে লইয়া বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। ছেলেটী ক[illegible] ভালবাসিত।

[illegible]লাপ? সেই কালসর্পিণী গোলাপ? বেশ্যার পরিণাম [illegible] থাকে, তাহার তাহাই হইয়াছিল। জীবনের শেষাংশে

নানারূপ কুৎসিত ব্যাধি তাহার দেহ পরিকীর্ণ করিয়াছিল। লোকের ঘৃণ্য হইয়া, শৃগাল কুকুরের ন্যায় সর্ব্বস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া, সে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। দীনহীনের ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া অবশেষে পথিপার্শ্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।